ছুঁআনাজ।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর-প্রণীত

Calcutta:
PRINTED & PUBLISHED BY THE METCALFE PRESS.
76, Balaram Dev Street.
1906.

মূল্য ।৷০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

"ছ'আনাজ," মূলক-বার্ত্তাকু-প্রভৃতি ছয়টি তরকারির নিরামিষ ব্যঞ্জন। অগ্রহায়ণ মাসের গুহষষ্ঠীর দিনে ইহা পল্লীগ্রামে ব্যবহৃত হয়। সাহিত্য ও পূর্ণিমা পত্রে প্রকাশিত মল্লিখিত ছয়টি ক্ষুদ্র পল্লী-চিত্র ছ'আনাজ নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। ইহাতে গল্পের মাধুর্য্য বা বর্ণনা-চাতুর্য্য কিছুই নাই। সামান্য আখ্যান-বস্তু অবলম্বনে সহজ ভাষায় কতকগুলি সরল ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। সামগ্রী সুস্বাদ বা সদ্‌গন্ধ বিশিষ্ট হইলে, তাহাকে ফল কিংবা ফুল নামে অভিহিত করা চলে। স্বাদ গন্ধ নাই বলিয়াই আমি "ছ'আনাজ" নাম ব্যবহার করিলাম। বঙ্গীয় পাঠক ও সমালোচকবর্গ আমার 'অনাথ বালক,' 'সুরবালা' প্রভৃতিকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। "ছ'আনাজ" তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র তৃপ্তি সাধন করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। ইতি

চুঁচুড়া
৫ই ভাদ্র ১৩১৩ বঙ্গাব্দ

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

ছ'আনাজ।

আতিথ্য।

বাঙ্গালা ১২৭—সালের ২৭এ পৌষ মঙ্গলবার, কৃষ্ণপক্ষের দশমী। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রজনীর অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। যশোহরের তিন চারিক্রোশ উত্তরে একটী মাঠের মধ্য দিয়া তিনটী লোক হন্ হন্ করিয়া দক্ষিণ মুখে যাইতেছে। সহসা তাহারা সম্মুখে কিছু দূরে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইল। লোক তিনটী থামিয়া গেল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পরস্পর অতি দ্রুত দু'একটী কথা বলিয়া মাঠের পথ ছাড়িয়া পশ্চিম দিকের গ্রামাভিমুখে ছুটিল। এই দিকেই তাহাদের অতি নিকটে লোকালয় ছিল। ইহাদের ইচ্ছা রাত্রির জন্য কোন একটী বাড়ীতে আশ্রয় লইবে।

এই তিনটী লোকের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ; নাম চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী। পশ্চাতের দুইটী লোক হিন্দুস্থানী, নাম রঘুবীর ও রামশরণ সিং। ইহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ কএকটী দরিদ্র মুসলমান

কৃষকের বাড়ী দেখিতে পাইল এবং এক বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া চণ্ডীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, নিকটে কোন হিন্দুর বাড়ী আছে কিনা। একজন মুসলমান উত্তর করিল,—"সম্মুখে কিছু দূর গেলেই একটি সঙ্গতি-পন্ন বণিকের বাড়ী দেখিতে পাইবেন।" চণ্ডীচরণের অনুরোধে কৃষক তাহাদিগকে মধুবণিকের বাড়ী দেখাইয়া দিতে সম্মত হইল। বণিকের নাম মধু। গ্রামে সে মধু বেণে বলিয়া পরিচিত।

পথে যাইতে যাইতে কৃষক কহিল,—"আপনাদিগকে লইয়া চলিলাম বটে, কিন্তু মধু বেণে যে আপনাদিগকে থাক্‌বার যায়গা দেবে, তার তত ভরসা নাই। বেণের পয়সা খুব। দু'পাঁচ গ্রামের মধ্যে ওর টাকা না ধারে, এমন লোক কম। কিন্তু খরচের হাত একেবারেই খাটো। ভগবান বসুর বাড়ী গেলে আপনারা নিশ্চয়ই যায়গা পেতেন, কিন্তু সে আরও খানিকটা পশ্চিমে যেতে হয়। তাঁর পয়সা বেশী নাই, কিন্তু দু'চারজন লোক গেলে, কখনও ফেরান না। চণ্ডীচরণ কহিলেন, "আমরা একটু থাক্‌বার যায়গা পেলেই যথেষ্ট মনে করিব।" মুসলমান তাঁহাদিগকে মধুর দরজায় পঁহুছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

চণ্ডীচরণ দেখিলেন, মধুর বাড়ীটি ক্ষুদ্র নহে। বাহিরে খড়ের ঘর, ভিতরে একতলা কোটা। বাহিরের ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। গৃহস্বামী একজন চণ্ডাল চাকরের সঙ্গে সেখানে বসিয়া আছেন। তাহাদের মধ্যে কথা হইতেছে। মধুর বাড়ীতে কিছু দেশী তামাক জন্মিয়াছিল, তিনি হুকুম দিয়াছেন, ঐ তামাক মাখিয়া বাড়ীর খরচ চলিবে। চাকরটি সেই তামাক মাখিয়া কর্ত্তাকে নমুনা দেখাইতেছে এবং বলিতেছে,—"কেনা তামাক কিছু না মিশাইলে এ খাওয়া যাইবে না।" মধু বলিতেছে,—"আমি খেতে পারি, আর তোর মুখে রোচে না?"

চণ্ডীচরণ এত কথা শুনিতে পান নাই। মধু যখন গরম হইয়া

ভৃত্যকে তিরস্কার করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার সঙ্গিদ্বয় বণিকের বাহিরের ঘরের বারাণ্ডায় উঠিলেন। মধু তাঁহাদের পদ শব্দ শুনিতে পাইয়া "কে কে?" বলিয়া রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিল।

চণ্ডীচরণ কহিলেন,—"ব্রাহ্মণ, রাত্রি কাটাইবার জন্য একটু স্থান চাই।"

"এখানে স্থান টান্ হবে না।" মধুর স্বর আরও কর্কশ হইয়া উঠিল।

চণ্ডী। রাত্রিকাল, এখন যাই কোথায়? আমরা যাচ্ছিলাম যশোরে। ষোল ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসেছি। আজই যাব ঠিক করে বেরিয়েছিলাম। পথে বাঘের ডাক শুনে রাস্তা ছেড়ে গ্রামে ঢুকেছি। আমরা কেবল একটু থাকবার যায়গা চাই।

মধু। যায়গা টায়গা হবে না। অন্যত্র দেখুন।

চ। অন্যত্র কোথায় যাই? গ্রামের কা'কেও চিনি না। পথে বের হ'য়ে বাঘের হাতে মর্ব?

ম। ঠাকুর! আর কতবার বল্‌ব?

মধু এই সময়ে চণ্ডীচরণের সঙ্গী লোক দুটির প্রতি এক বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

চণ্ডীচরণ কহিলেন,—"ইহারা হিন্দুস্থানী। আমার মনিবের চাকর। লাটের কিস্তির খাজনা দিতে যাচ্ছি। এদের কাছে হাজার বারশ' টাকা আছে।"

ম। টাকা আপনার হাজার বারশ থাক্, আর ন' শ' পঞ্চাশ থাক্, সঙ্গেই আছে। আমার এখানে থাকা হচ্ছে না।

চ। আপনার ঘর দোর আছে—ঘরে লক্ষ্মী আছেন। তিনটি অতিথিকে যায়গা দিতে এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন? আমরা এই বাহিরের ঘরটায় প'ড়ে থাক্‌ব।

ম। কড়া কথা না শুন্‌লে দেখ্‌ছি আপনারা নড়্‌বেন না। বল্‌ছি যে, বিদেশী লোককে আমি কখনও যায়গা দিই না।

চ। স্বদেশী লোক হ'লে আর এমন ভাবে আসবে কেন?

ম। আপনার কথার ত বেশ বাঁধুনী আছে।

চণ্ডীচরণ বেগতিক দেখিয়া কহিলেন,—"আমরা কোথায় গেলে রাত্রি কাটাইবার জন্য একটু যায়গা পাই, বল্‌তে পারেন?"

প্রশ্ন করিবার সময়ে চণ্ডীচরণ মধুর ভৃত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

মধু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ভৃত্যটি কহিল,—"মশাই, ভগবান বোসের বাড়ীতে যান, নিশ্চয় যায়গা পাবেন।

চ। পথ ত চিনি না, আর এই অন্ধকার রাত্রি।

মধুর চাকর মহেশ বলিল,—"চলুন, আমি আপনাদিগকে সেখানে দিয়া আসিতেছি।"

মধু এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিল না।

পথে বাহির হইয়া চাকরটী কহিল,—"এমন বাড়ীতেও মানুষ আসে? কি করিব? কতকগুলি টাকা ধারি। সুদের সুদ তস্য সুদ দিতে দিতে শোধ হয় না। গায়ে খেটে শোধ কর্‌ছি। এমন চামারের ব্যবহার আর দেখি নাই। নামে মধু, কিন্তু কাজে নিম। অল্প টাকা? কত লোকের গয়না পত্র থালা বাসন বাঁধা রেখে রেখে শেষে বেচে নিয়েছে। এখনও কত ঘরে মজুত আছে। হাত পাত্‌তেই শিখেছে;—উপুড় কর্ত্তে আর শেখে নাই। চলুন ভগবান বোসের বাড়ী। টাকা কড়ি বেশী নাই সত্য, মধ্যে মধ্যে এই বেণের টাকাও কর্জ্জ করেন;—কিন্তু মন কত বড়! গঙ্গাস্নানের যাত্রী—ব্যারাম হয়ে পথে প'ড়ে আছে—খবর পেলেই বসু মহাশয় তারে তুলে এনে বাড়ীর লোকের মতন সেবা করেন। অতিথ

ফকির বৈষ্ণব গেলে যেমন শক্তি দেবেনই দেবেন। মুখের কথা শুনেই লোকে তুষ্ট।"

চণ্ডীচরণ কেবল হাঁ হুঁ করিয়া কথার সায় দিতেছিলেন। বণিকের ব্যবহারই তাঁহার মনে হইতেছিল। তিনি এমন লোক অতি অল্পই দেখিয়াছেন। ভগবানের প্রশংসায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। সহসা মহেশ কহিয়া উঠিল,—"এই সাম্‌নে বোস্‌ মহাশয়ের বাড়ী।"

তাঁহারা দেখিলেন, বাহিরের ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু সেখানে কোন লোক নাই। মহেশ 'কর্ত্তা বাড়ী আছেন?' বলিয়া ডাকিতেই ভগবান বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন। ভগবানের মুখ প্রফুল্ল নহে। চণ্ডীচরণের মনে আশঙ্কার উদয় হইল। তিনি কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত তাঁহাদের গ্রামে আগমনের কারণ ও বণিকের ব্যবহার সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। ভগবানের গুণকীর্ত্তন জ্ঞাপন করিতেও ভুলিলেন না। "আপনি ব্রাহ্মণ, প্রাতঃপ্রণাম, বসুন"—এই কথা বলিয়া ভগবান বসিবার আসন দেখাইয়া দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

চণ্ডীচরণ আশ্বস্ত হইলেন। মধু বণিকের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তাঁহার যেমন মনে হইতে ছিল যে, এমন গ্রামে আসা আর বাঘের মুখে যাওয়া প্রায় একই কথা, সেই ভাবটা মন হইতে অনেকটা দূর হইল।

২

কিয়ৎকাল পরেই একটি ভৃত্য পা ধুইবার জল ও তামাকু আনিয়া দিল। চণ্ডীচরণের পাকে দুইটী হিন্দুস্থানী খাইবে কি না প্রশ্নে "না" উত্তর পাইয়া লোকটি দুইটি রন্ধনের স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিল। চণ্ডীচরণ নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীর ঘাটে মুখ হাত ধুইয়া এবং সন্ধ্যা পড়িয়া

ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, পাকের আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত। গৃহস্বামীকে আর একবারও দেখিতে না পাইয়া চণ্ডীচরণের মনে একটু কেমন কেমন বোধ হইল, কিন্তু তিনি তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না। জঠরানল বড়ই জ্বলিতেছিল, ব্রাহ্মণ রন্ধন আরম্ভ করিলেন।

সহসা গৃহস্বামী চণ্ডীচরণের রন্ধন-গৃহের সম্মুখে আসিয়া চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাকের সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে কি না। ভৃত্য 'হাঁ' বলিয়া উত্তর করিলে, ভগবান একবার ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং কোন কথা না কহিয়াই পুনরায় বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যও তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।

কিছুকাল পরেই একটি লোক চণ্ডীচরণের সম্মুখ দিয়া বাটীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া চণ্ডীচরণ বুঝিতে পারিলেন যে, লোকটি হয় অন্য স্থান হইতে আসিয়াছেন, নতুবা অন্যত্র যাইবেন। তিনি বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া চাকরকে ডাকিয়া তাহার নিকট তামাকু চাহিলেন। চণ্ডীচরণও এই সময়ে তামাকু খাইতে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। চণ্ডীচরণ এই লোকটিকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন,—"আমি কবিরাজ।"

চণ্ডীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বাড়ীতে কাহারও অসুখ আছে কি?"

কবিরাজ। আজ্ঞা হাঁ, ভগবান বসু মহাশয়ের একমাত্র কন্যা, তাহারই অসুখ। পীড়ার অবস্থা খুবই খারাপ! আজ বৈকাল থেকে আমি এখানে আছি। রাত্রিতে কি হয় বলা যায় না।

চণ্ডীচরণ আরও দু'চারিটি প্রশ্ন করিয়া রোগের অবস্থা অনেকটা বুঝিয়া লইলেন। কবিরাজ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া শেষে কহিলেন,— "মহাশয়! মনে হইতেছে যেন আমার নিজের সন্তানের অসুখ হইয়াছে। বসু মহাশয়ের ন্যায় সরল সাধুপ্রকৃতি ও পরোপকারী লোক এ অঞ্চলে নাই

বলিলেও চলে। এই একমাত্র পাঁচ বৎসরের কন্যাই বসুজার ও তাঁহার গৃহিণীর সংসারের অবলম্বন। ভগবান আছেন—এর চেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েও ত দু'চারিটি রোগীকে বাঁচ্‌তে দেখেছি।"

সমস্ত শুনিয়া চণ্ডীচরণের প্রাণ ভগবানের প্রতি ভক্তি ও সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন—এমন লোক রাস্তা থেকে ওলাউঠার রোগী কুড়াইয়া আনিবে, ইহা বিচিত্র নয়। তাঁহার মনে হইল, মধু বণিকের ন্যায় লোক যেমন তিনি অল্প দেখিয়াছেন, তেমনই ভগবান বসুর ন্যায় লোকও বোধ হয় তিনি দেখেনই নাই।

কবিরাজের কথা শেষ হইলে, চণ্ডীচরণ মুহূর্ত্তমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবান ত আছেনই; তিনি এই বালিকাকে অবশ্যই বাঁচাইবেন।"

চণ্ডীচরণ যে ক্ষুদ্র গৃহে পাক করিতেছিলেন, উহা অতিথির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট রন্ধনশালা, অন্দর হইতে বাহিরের ঘরে আসিবার পথে। ভগবান পুনরায় কন্যাকে ছাড়িয়া সেখানে আসিয়াছেন, এবং চণ্ডীচরণকে দেখিতে না পাইয়া চাকরকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"ঠাকুরটি কোথায় গেলেন? তাঁর ভাত বুঝি নষ্ট হয়ে গেল।"

চণ্ডীচরণ হুঁকা ছাড়িয়া রন্ধন গৃহের দিকে আসিলেন। ভগবানের কাতর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার প্রাণের আবেগ বর্দ্ধিত হইল। তিনি কহিলেন,—"আমি সমস্তই শুনিয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আপনার কন্যা নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে। ভগবান আপনাকে কষ্ট দিবেন না। আমি একবার কন্যাটিকে দেখিতে চাই।"

ভগবান কহিলেন,—"আপনি আহার করুন, তার পর দেখিবেন।"

৩

আহারান্তে চণ্ডীচরণ বাটীর ভিতরে গেলেন। বাড়ীর কোন আত্মা-

য়ের ন্যায় তিনি একবারে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে নীত হইলেন। চণ্ডীচরণ দেখিলেন, পীড়ার অবস্থা অতিশয় আশঙ্কাজনক বটে। একুশ দিনের জ্বরে কন্যাটি কঙ্কালসার হইয়াছে। এখন অতি কঠিন বিকারের অবস্থা। বালিকা প্রলাপ বকিতেছে। তাহার মুখ ও চক্ষুর অবস্থা ভীতিজনক।

ভগবানের গৃহিণী চণ্ডীচরণের শুইবার বিছানা চাকরটীর নিকট দিতে-ছিলেন। চণ্ডীচরণ আসিতেছেন দেখিয়াই তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ ঘরে আসিলেই তিনি বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তিনি কন্যাটিকে দেখিতে পান—অথচ তাঁহাকে গৃহস্থিত কেহ দেখিতে না পায়, এমন স্থানে বসিলেন। সহসা দুহিতার দু' একটি অসম্বদ্ধ বাক্য শুনিয়া তাঁহার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

চণ্ডীচরণ সহজেই বুঝিতে পারিলেন, বালিকার মাতাই ক্রন্দন করি-তেছেন। ব্রাহ্মণের সহানুভূতি শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। ভগবানের অশ্রু-সিক্ত চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি আর হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। অন্তঃকরণের অন্তস্তল হইতে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"আপনারা কাঁদিবেন না, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি এই কন্যা আরোগ্য লাভ করিবে। যদি আমি ব্রাহ্মণ হই, আমার আশীর্ব্বাদ সফল হইবে। এ বালিকা বাঁচিবেই বাঁচিবে।"

চণ্ডীচরণ কোন্ সাহসে এতবড় কথাটী বলিয়া ফেলিলেন, তাহা আমরা বুঝাইয়া দিতে পারিব না। এই মাত্র বলিতে পারি যে, মানুষের ভক্তি ভালবাসা কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি অন্তঃকরণের কোমল ও মধুর ভাব নিচয় পবিত্র

ও অকৃত্রিম আবেগময় হইলে, অনেক সময়ে পার্থিব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখে না,—যুক্তি তর্কের ধার ধারে না এবং অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে।

মানুষ যেমন কাহারও কর্তৃক অন্তরে দারুণ আঘাত পাইলে তাহাকে অভিসম্পাত করে এবং অনেক সময়ে সেই অভিশাপ হাতে হাতে ফলিয়া থাকে, তেমনই কাহারও নিকটে কোন আশাতীত উপকার পাইয়া মানুষ তাহাকে যদি প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করে, তবে তাহা সফল হইবে না কেন?

গৃহস্বামী অতিথি ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন. তাঁহার কথা কয়েকটী ভগবানের হৃদয়ে যেন বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্য করিল। চিন্তা ও আশঙ্কার তিমির অপসৃত হইয়া সহসা সেখানে আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিল। তিনিও প্রাণের আবেগে কহিয়া উঠিলেন,—"ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া যখন এমন কথা বাহির হইয়াছে, তখন আমার কন্যা অবশ্যই বাঁচিবে।" চণ্ডীচরণের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—"আপনি এই বালিকাকে বাচাইবার জন্যই আজ আমার বাড়ীতে পদধূলি দিয়াছেন।"

ভগবান নত হইয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া নিজের ও কন্যার মস্তকে লেপন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"ঘরে এস, লজ্জা নাই; ঠাকুরকে প্রণাম কর,—পদধূলি নাও।"

গৃহিণী স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিলেন, এবং তাঁহার কথামতই আর গৃহত্যাগ করিলেন না; অবগুণ্ঠনে মস্তক ঢাকিয়া কন্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

চণ্ডীচরণ চিকিৎসক না হইলেও একজন বহুদর্শী লোক বটেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া দু'একটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলেন। কবিরাজ তাহার অনুমোদন

করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। চণ্ডীচরণ বালিকার মস্তকে হস্ত রাখিয়া ছ' একটি স্তব পাঠ করিলেন। রাত্রি ছুই প্রহরের পর বালিকার তন্দ্রার আবেশ হইল। চিকিৎসক কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; ভগবান ও গৃহিণীকে বালিকার নিকটে রাখিয়া তিনি ও চণ্ডীচরণ বাহিরে আসিলেন।

৪

চণ্ডীচরণ শয়ন করিলেন। তাঁহার কেবল মাত্র নিদ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে দূরে এক বিষম গোল শুনিয়া তিনি জাগরিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গী হিন্দুস্থানী ছুই জন উঠিয়া বসিয়াছে। মানুষের চীৎকার ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য ভগবানের একজন সাহসী ভৃত্য যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

রামশরণ ও রঘুবীর সিং চণ্ডীচরণকে কহিল,—"আপনি যদি টাকাটা আগুলিয়া কিছুকাল বসিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা একবার দেখিয়া আসি।" চণ্ডীচরণ বিশেষ আপত্তি করিলেন না। হিন্দুস্থানীদ্বয় ভগবানের ভৃত্যের সহিত দৌড়াইল।

মধু বণিকের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে। দস্যুগণ সংখ্যায় অধিক নহে। আট দশ জন মাত্র। ছুইজন মধুকে ধরিয়া রাখিয়াছে ও তাহাকে পীড়ন করিতেছে। অবশিষ্ট লোকেরা গৃহে প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত অর্থের অনুসন্ধান করিতেছে। ভগবানের বাঙ্গালী ভৃত্যের সাহসে কুলাইত না। কিন্তু রঘুবীর ও রামশরণের শরীরে বাঙ্গালীর রক্ত নহে। তাহারা তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া অসীম সাহসের সহিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল, এবং বিষম জোরে একটা শব্দ করিয়া মধুর সমীপস্থ আততায়ী দস্যুদ্বয়ের উপর পতিত হইল। দস্যুগণ এরূপ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। যম-কিঙ্কর সদৃশ ছুই দীর্ঘকায় হিন্দুস্থানী ও তাহাদের হস্তস্থিত

প্রকাণ্ড বংশখণ্ড দেখিয়া তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল, এবং নিজেদের মধ্যে একটি সঙ্কেতবাক্য উচ্চারণ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। রঘুবীর ও রামশরণের পক্ষে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা অসম্ভব।

উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মধু প্রথমেই অনুসন্ধান করিতে লাগিল, তাহার কি কি অপহৃত হইয়াছে। সে যখন জানিতে পারিল যে, নগদ টাকা ও মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি যাহা কিছু ছিল সমস্তই গিয়াছে, তখন তাহার পরিতাপের পরিসীমা রহিল না। সে কেবল বলিতে লাগিল,—"আমি কেন মরিলাম না। যখন আমার সকলই গেল, তখন আমি কেন রহিলাম। ডাকাতেরা আমাকে মারিতে আসিয়াও কেন আমাকে মারিল না?"

বস্তুতঃ যখন রঘুবীর ও রামশরণ মধুর বাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন দস্যুরা তাহাদের কাজ গুছাইয়াছে। আরও কিছু আছে কি না, তাহারা কেবল এই অনুসন্ধান করিতেছিল, এবং যখন তাহারা পলাইয়া যায়, তখন মধুর প্রায় সর্ব্বস্বই তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল।

দুইটি লোক আসিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়া থাকিলেও মধু উদ্ধার-কর্ত্তাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর পায় নাই। হিন্দুস্থানীদ্বয় তাহার কৃতজ্ঞতা পাইবার প্রত্যাশীও ছিল না। মধু দ্বারে আসিয়া সমস্ত দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। দস্যুগণের আগমন সময় হইতেই তাহার মনে ধারণা হইয়াছিল যে, সন্ধ্যার পর যে তিনটি লোক অতিথিভাবে তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহারাই ডাকাইতি করিতেছে। মধুর সে বিশ্বাস এখনও অপনীত হয় নাই। মধু কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"শালারা সন্ধ্যাকালে অতিথি সাজিয়া আসিয়া বাড়ী ঘর সব দেখিয়া গিয়াছিল। তখনই আমি জানি

যে, আজ আমার সর্ব্বনাশ হবে।" মধুর সেই চণ্ডাল চাকরটি নিকটে ছিল। সে দূর হইতে সমস্তই দেখিয়াছিল। মধুর কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল,—"সেই অতিথিই তোমাকে বাঁচালে। তাদের যদি যায়গা দিতে, তা হ'লে আর এমন একখানা হ'ত না।"

মধুর চমক ভাঙ্গিল। তাহার মনে হইল, যে দুইটি লোক আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছে, তাহারা সেই সন্ধ্যাকালের ব্রাহ্মণের সঙ্গের লোকের মতন বটে।

রঘুবীর ও রামশরণ ফিরিয়া চণ্ডীচরণকে সমস্ত কহিল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ইহারা কেহই আর নিদ্রা গেল না। চণ্ডীচরণ প্রাতঃকৃত্য সমাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে যশোহর যাত্রার পূর্ব্বে চণ্ডীচরণ আর একবার ভগবানের কন্যাটিকে দেখিয়া গেলেন। তখন তাহার অবস্থা কিছু ভাল। চক্ষুর দৃষ্টি কতকটা স্বাভাবিক, অনেকটা আশাপ্রদ। কবিরাজ কহিলেন,—"এখন জীবনের আশা করা যাইতে পারে।"

চণ্ডীচরণ হৃষ্টচিত্তে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৫

চণ্ডীচরণ একজন কায়স্থ জমিদারের কর্ম্মচারী। তাঁহার সঙ্গী হিন্দুস্থানীদ্বয় ঐ জমীদারেরই ভৃত্য। জমীদারের নাম যোগেশ চন্দ্র রায়। বার্ষিক আয় ত্রিশ সহস্র টাকা হইবে। যোগেশ নাবালক। বয়স দশ এগার বৎসর মাত্র। তাঁহার মাতা জীবিতা আছেন। চণ্ডীচরণ যোগেশের পিতামহের সময় হইতে ইঁহাদের কর্ম্ম করিতেছেন। চণ্ডীচরণ বড়ই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী; জীবনে কখনও মনিবের অনিষ্টজনক কার্য্য করেন নাই। তাঁহার প্রতি যোগেশের মাতার অখণ্ড বিশ্বাস। যোগেশ তাঁহাকে ঠাকুরদাদা বলিয়া সম্বোধন করেন। জমীদারীর সমস্ত ভারই চণ্ডীচরণের

হন্তে। এবার দু'একটী মহালের প্রজা উপযুক্ত সময়ে খাজনা দেয় নাই বলিয়া, পৌষ কিস্তির রাজস্ব দিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সময় অল্প বলিয়া এবং অন্যকে বিশ্বাস করা ঠিক নহে বিবেচনায়, চণ্ডীচরণ স্বয়ং যশোহর যাইতেছিলেন। পথে এক রাত্রিতে যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

চণ্ডীচরণ বেলা এক প্রহরের পূর্ব্বেই যশোহর পৌঁছিলেন, এবং সমস্ত দিনে মনিবের কার্য্য শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে ইচ্ছা করিয়া পুনরায় ভগবানের বাটীতে আসিলেন। কন্যাটীর অবস্থা তখন বিশেষ আশাপ্রদ। চণ্ডীচরণকে দেখিয়া ভগবান যেন তাঁহার একজন নিকট আত্মীয় পাইলেন বলিয়া মনে করিলেন। এক রাত্রির পরিচয়েই তাঁহাদের পরস্পরে সদ্ভাব এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ভগবান তাঁহাকে একজন আপনার লোকের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ভগবানের এক খুড়ার নাম ছিল চণ্ডী, ইহার উল্লেখ করিয়া ভগবান তাঁহাকে 'খুড়োঠাকুর' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে চণ্ডীচরণ যখন বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন, তখন কবি-রাজ কহিলেন,—"ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছে, বালিকা রক্ষা পাইবে, এখন নিশ্চয় এ কথা বলা যায়।"

বাড়ীর সকলেই চণ্ডীচরণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ভগবান অশ্রু-পূর্ণ লোচনে কহিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদেই আমি কন্যার জীবন পাইলাম। প্রার্থনা এই যে, যখনই এ পথে আসিবেন, যেন অধমের এখানে পদধূলি দিতে না ভুলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পরেই চণ্ডীচরণ গৃহে ফিরিলেন। অন্যান্য কথা বলিয়া তিনি যোগেশ ও তাহার মাতার নিকট মধুবেণের কথা ও ভগবান বসুর কথা কহিলেন। রাত্রিতে তাঁহারা কিরূপ বিপদে পড়িয়া ভগ-

বানের বাটীতে যান, ভগবান কি অবস্থায় তাঁহাদিগকে আহার ও স্থান দেন, তাঁহার কন্যার পীড়া ও আরোগ্যের সম্ভাবনা ইত্যাদি সমস্ত বর্ণিত হইল।

যোগেশচন্দ্র দু'একটী প্রশ্ন করিলেন। কহিলেন,—"মধু আপনাদের ডাকাত ঠাওরাইয়াছিল?"

চণ্ডীচরণ উত্তর করিলেন, "হাঁ!"

যো। তার যথাসর্ব্বস্ব গেছে?

চ। যথাসর্ব্বস্বই প্রায়। সে রাত্রি হয় ত ডাকাতি হ'তই। আমাদের থাকতে না দেওয়া, লোকে তার কারণ বলে বিশ্বাস করিল। ক্ষুধার্ত্ত বা বিপন্ন অতিথিকে ফিরানো সহজ কথা নয়। তোমার ঠাকুর-মা সাবিত্রী ব্রতের উপবাস ক'রে একদিন নীচের ঘরে শুয়ে আছেন। সহসা বেলা আড়াই প্রহরের সময় ঘুম হইতে জাগিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমাদের বীরপুরের কাছারী পুড়িয়া গেল। একজন ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া কাছারীতে আহার করিতে চাহিয়াছিল; তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়ার কিছুকাল পরেই আগুন লাগিয়াছে।" তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তখন তোমার ঠাকুর-দাদা জীবিত ছিলেন। তোমার ঠাকুরমার মত পুণ্যবতী স্ত্রীলোক আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার কথায় কেহ অবিশ্বাস করিল না। সেই দিন সন্ধ্যাকালেই সংবাদ আসিল, কাছারী বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুধার্ত্ত অতিথি ফিরাইবার কথা নায়েব অস্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তোমার পিতামহ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, কথা ঠিক। তদবধি নায়েবকে অতিথির খোরাকী বলিয়া বৎসরে ১২০৲ অতিরিক্ত দেওয়া হইয়া থাকে। কাছারী এখন পাকা হইয়াছে।

যোগেশচন্দ্র মন দিয়া সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যে বাড়ীতে আপনারা যায়গা পেলেন, সে বাড়ীর সে মেয়েটী ভাল হবে ঠিক?"

চ। নিশ্চয়ই ভাল হবে। এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে। মেয়েটি ত নয় যেন মোমের পুতুলটী।

যো। আপনি একখানা চিঠি লিখে খবর নেবেন?

চ। তা নেব।

৬

এই ঘটনার পর ৭।৮ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চণ্ডীচরণ আট দশ বার যশোহর যাইবার সময়ে ভগবানের বাড়ীতে গিয়াছেন। ভগবান, তাঁহার গৃহিণী ও কন্যাটি তাঁহাকে অসীম ভক্তি করেন। চণ্ডীচরণকে বাটীতে আসিতে দেখিলেই বালিকা যাইয়া মাকে বলে,—"মা, সেই দাদা-ঠাকুর আসিয়াছেন।" বালিকা অনেক সময় ব্রাহ্মণের পা ধুইবার জল আনিয়া দেয়, বাড়ীর ভিতর হইতে তাঁহার নিমিত্ত দুধ, জলখাবার, পান ইত্যাদি লইয়া আসে। বৃদ্ধ চণ্ডীচরণ তাহার সরল আদর ও সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। বাড়ী ফিরিলে তাঁহার মুখে ভগবানের কন্যার সুখ্যাতি ধরে না। এমন সুলক্ষণা কন্যা আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি—যেমন রূপ তেমনই গুণ; এ মেয়ে যে ঘরে যা'বে সে ঘরের উন্নতি হবেই হ'বে, ইত্যাদি কত কথাই তিনি বলেন।

চণ্ডীচরণ লক্ষ্য করিতেন না যে, যখনই তিনি ভগবানের কন্যার কথা তুলিতেন, তখনই যোগেশচন্দ্র কান পাতিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতেন। যোগেশের সহিত এই বালিকার বিবাহ হইতে পারে, এমন চিন্তা ব্রাহ্মণের মনে কখনও আসে নাই। কেন না উভয় পরিবারে অবস্থার অতিশয় পার্থক্য। যোগেশের মাতা পুত্রের বিবাহের কথা উঠিলেই ধনবান্ বৈবাহিকের কথা বলেন।

বরের দর এই সময়ে চড়িয়া উঠিয়াছে। সহরে কায়স্থের কন্যার বিবাহ বিষম ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে পল্লীগ্রামে

পাত্র খুঁজিতেছেন। কালকাতার কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের কন্যার সহিত যোগেশের বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য আজ একজন ঘটক তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছেন। চণ্ডীচরণ ঘটকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। যোগেশের মাতা অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত শুনিতেছেন। যোগেশচন্দ্র নিকটে নাই।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঘটক উঠিয়া মুখহাত ধুইতে গেলেন। যোগেশ চন্দ্র বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনের ভাব দেখিয়া চণ্ডীচরণ বুঝিলেন, তিনি যেন ঘটকের স্থানত্যাগের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। যোগেশচন্দ্র পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, এবং চণ্ডী-চরণকে দেখিতে পাওয়া যায়—এইরূপ স্থানে উপবেশন করিলেন। নিজের কতকগুলি কাগজপত্র নাড়িয়া চাড়িয়া তিনি সহসা চণ্ডীচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুরদাদা, আপনার সেই নাতিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে?"

এমন সময়ে এমন ভাবে এই প্রশ্ন? চণ্ডীচরণ মুহূর্ত্ত মধ্যে ইহার অর্থ বুঝিয়া লইলেন, এবং কহিলেন,—"কেন? বিবাহ হয় নাই। পাত্রের অনুসন্ধান চলিতেছে। আমার সে নাতিনীটীকে বিয়ে করিবে দাদা?" চণ্ডীচরণ যোগেশকে আদর করিয়া দাদা বলিয়া ডাকিতেন।

যোগেশচন্দ্র নতমুখে উত্তর করিলেন,—"আপনি যদি মাকে বুঝিয়ে তাঁর মত কর্ত্তে পারেন।"

চ। আমার ভাইপো ভগবান গরীব, সে তোমাকে হীরের আঙ্গটী, সোণার ঘড়ি, এসব কিছুই দিতে পারিবে না।

যো। আমি কিছুই চাহিনা। আপনার কাছে যত দূর শুনিয়াছি, এমন পিতা মাতার সন্তান কখনও সামান্য স্ত্রীলোক হইবার কথা নহে। সংসারে আমার আপনার বল্‌তে মা আর আপনি। আমি শৈশবে পিতৃহীন। আপনিই ত আমার সমস্ত রক্ষা করিয়াছেন। এ বিবাহে

আপনার মত হইবে, আমি নিশ্চয়ই জানি। যদি ম'র মত কর্ত্তে পারেন। সেই রাত্রিতে বসু মহাশয় আপনাকে ও আমার লোক দুটিকে বাটীতে স্থান দিয়া যে মহত্ব দেখাইয়াছেন,—যে উপকার করিয়াছেন,—এতে যদি তার বিন্দুমাত্রও শোধ হয়—"

যোগেশের অপাঙ্গে অশ্রু দেখা দিল।

চণ্ডীচরণ যোগেশের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া কহিলেন, "এই বিবাহই হবে দাদা। আমার কথা মা কখনই অবহেলা করিবেন না।'

ব্রাহ্মণ যোগেশের মাকে মা বলিতেন।

বস্তুতঃ চণ্ডীচরণের মুখে এই বালিকার কথা শুনিয়া অবধি যোগেশচন্দ্র আপনার মনে তাহার একটি ছবি আঁকিয়া ছিলেন। বালিকার বয়স যত বাড়িতেছিল, চণ্ডীচরণের মুখে তাহার বর্ণনা শুনিয়া যোগেশের চিত্তে সেই ছবি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল। তিনি এ পর্য্যন্ত মনের কথা বলিবার সুযোগ পান নাই। সেই দিন রাত্রিতেই যোগেশচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া চণ্ডীচরণ তাঁহার মাতার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। যোগেশের মনের ভাব তাঁহাকে জানান হইল। জননী দু' চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াই পুত্রের ও ব্রাহ্মণের মতে মত দিলেন।

উপসংহার।

যোগেশচন্দ্রের সহিত ভগবানচন্দ্র বসুর কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যোগেশ এখন অর্দ্ধবয়স্ক। তাঁহার দুইটি সন্তান জন্মিয়াছে। যোগেশের মাতা কাশীতে গিয়াছেন, জীবনের শেষ ভাগ সেখানে যাপন করিবেন। ভগবানও সস্ত্রীক সেখানে আছেন। বৃদ্ধ চণ্ডীচরণের কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে।

তাঁহার পুত্র এখন যোগেশের প্রধান কর্ম্মচারী। ইহার উপর সমস্ত ভার রাখিয়া যোগেশচন্দ্র স্ত্রীপুত্র সঙ্গে লইয়া কাশীতে মাকে ও শ্বশুরশাশুড়ীকে দেখিতে যাইতেছেন। ডাক গাড়ীতে একখানি গাড়ী রিজার্ভ করিয়া তাঁহারা রাত্রিতে হাবড়া হইতে রওনা হইয়াছেন। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। বালক বালিকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্বামি-স্ত্রী জাগরিত থাকিয়া মধুপুরের পাহাড় ও জঙ্গল দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। যোগেশের পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ জঙ্গলে বাঘ আছে ?"

যো। বাঘ আছে বই কি ?—বাঘের কথা উঠ্‌লেই আমার সেই চণ্ডী ঠাকুরদাদাকে বাঘে তাড়ানোর কথা মনে হয়। এমন উপকারী বন্ধু আর হবে না—

উভয়ের মুখ শোকাচ্ছন্ন হইল। স্বর্গীয় ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দম্পতি দু' চারি বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন !

যোগেশচন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিয়া কহিলেন,—'চণ্ডী ঠাকুরদাদাকে বাঘে তাড়া করেছিল, আর মধু বণিক জায়গা দেয় নাই বলেই আমি এমন রত্নের অধিকারী হইয়াছি।" "এমন" কথাটির সঙ্গে সঙ্গে যোগেশচন্দ্র অতি আদরের সহিত স্ত্রীর চিবুক ধারণ করিলেন।

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"রত্নলাভ তোমার, না আমার ?"

যো। যারই হ'ক,—হয়েছে। এখন একটু ঘুমোবে ? রাত্রি কম হয় নাই।

পবিত্র প্রণয়পীযুষসিক্ত কথোপকথনতৃপ্ত দম্পতিকে পুণ্যক্ষেত্র কাশী-তীর্থের পথে রাখিয়া আমরা পাঠকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

কমলা।

(১)

বিনোদপুরের বামনদাস বিদ্যারত্ন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বিনোদপুর বরিশাল জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রাম। বিদ্যারত্ন সংস্কৃত সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আমরা প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। বামনদাস শাস্ত্র ব্যবসায় ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই বাড়ীতে আসিয়া একটি টোল খুলিয়াছিলেন, তাহাতে আট দশটি ছাত্র অধ্যয়ন করিত। বলা বাহুল্য, বামনদাস কেবল তাঁহাদিগকে বিদ্যাদান করিতেন, এমন নহে; সঙ্গে সঙ্গে অন্নদানও করিতেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। পৈতৃক কয়েক বিঘা ব্রহ্মত্র জমিই তাঁহার সম্বল। আর সময়ে সময়ে শ্রাদ্ধাদিতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিদায় মিলিত। বামনদাসের সময়ে পল্লীগ্রামের পণ্ডিতদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই, উপাধি পরীক্ষারও সৃষ্টি হয় নাই। এদিকে বর্ণিত সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে

হইতেই দেশে হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অনাস্থার স্রোতঃ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল ; সুতরাং শ্রাদ্ধাদিতেও তেমন প্রাপ্তি ছিল না। আজ কাল দেখিতে পাই, দু' এক স্থলে কেহ পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করিলে সংবাদ-পত্রে তাহা সৎকর্ম্ম বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত সংবাদ পত্রের জন্মের বহুপূর্ব্বে বঙ্গের এক এক শ্রাদ্ধে যে বিপুল অর্থরাশি ব্যয়িত হইত, তৎসমুদায়ের লিপিবদ্ধ ইতিহাস না থাকিলেও জনশ্রুতি তাহা সহজে ভুলিতে দিবে না। অধুনা বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে স্বর্ণকার বিদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে!

বস্তুতঃ বামনদাস বড় অসময়েই অধ্যাপনা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অগাধ শাস্ত্র জ্ঞান, তাঁহার অন্ন সংস্থানের সহায়তা করা দূরে থাকুক, বরং ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। ছাত্র গুলি না থাকিলে তাঁহার সামান্য আয়েই ক্ষুদ্র পরিবারের ব্যয় অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু কৌলিক প্রথানুসারে অধ্যয়নার্থ ছাত্র আসিলেই বামনদাস সাদরে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতেন এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে যত্নও করিতেন। 'উহাদের জন্যই আমার আর্থিক কষ্ট' এমন কথা কখনই তাঁহার মনে আসিত না। ব্রাহ্মণ তাঁহার দরিদ্রতাতেই সন্তুষ্ট। তাঁহার মনে শক্তি ছিল, কিন্তু হিংসা ছিল না। সংসারে কত নিরেট মূর্খ পা ছড়াইয়া বসিয়া অর্থের অপব্যবহার করিতেছে বলিয়া কখনও তাঁহার মনে কষ্টের উদয় হয় নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণী অতিশয় গুণবতী ছিলেন। ছাত্রগণ সকলে শিষ্ট শান্ত এবং অধ্যাপকের অতিশয় বাধ্য ছিল। সে সময়ে লোকের ভরণ পোষণের ব্যয়ও বর্ত্তমান কালের ন্যায় অধিক ছিল না। বামনদাস জমিতে ধান পাইতেন। শাক সব্‌জি বাড়ীতে জন্মিত। তিন চারিটি গাভী ছিল, দুগ্ধ প্রায়ই কিনিতে হইত না। ব্রাহ্মণী সমস্ত গৃহ কর্ম্ম করিতেন ; ছাত্রেরাও যথেষ্ট সাহায্য করিত। প্রয়োজন হইলে সময়ে সময়ে তাহারা জল তুলিয়া

দিত, এবং বাড়ীর শুক্‌নো গাছ পালা হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত। হাটে বাজারে তাহারাই যাইত, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যাদি বহন করিয়া আনিতে লজ্জা বোধ করিত না। অনেক সময়ে তাহারা গাভী গুলিরও সেবা করিত, এবং তাহাদিগকে তৃণ দুর্ব্বা আহার দিত। পরিবারস্থ সকলেরই পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল। অলঙ্কারের আড়ম্বর ত ছিলই না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে জামা জুতার প্রচলন তখনও সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। বামনদাস চিরদিনই ধুতি চাদর এবং সময়ে সময়ে চটি জুতা মাত্র ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। এখন যেমন শুনিতে পাই, বড়লোকের বাড়ীতে ধূলি পায়ে প্রবেশ অপরাধে কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে মর্ম্মান্তিক অপমান সহ্য করিতে হয়, বামনদাসের সময়ে কাহাকেও এরূপ ভাবে লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই।

আমরা বামনদাসের ক্ষুদ্র পরিবারের কথা কহিয়াছি, কিন্তু সেই পরিবারে কয়জন লোক, তাহা বলা হয় নাই। বামনদাসের এক পুত্র, এক কন্যা; ব্রাহ্মণীর নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরের অধ্যায়ে আমরা যে সময়ের কথা বলিব, তখন পুত্রটির বয়স বার তের বৎসর, এবং কন্যাটির পাঁচ বৎসর মাত্র।

২

বামনদাসের পুত্রের নাম প্রিয়নাথ, কন্যার নাম কমলা। প্রায় দুই বৎসর হইল, প্রিয়নাথের উপনয়ন হইয়া গিয়াছে। এই উপনয়ন উপলক্ষে বামনদাস কিছু ঋণ করিয়াছেন। গ্রাম্য মহাজন ভৈরব তাঁহার উত্তমর্ণ; ভৈরব মহাজন জাতীয় লোক। নিজের জীবনে বাল্যে ও যৌবনে পরিশ্রম এবং প্রতারণা, পরে প্রৌঢাবস্থায় পরের রক্তশোষণ করিয়া সে অনেক অর্থের অধিকারী হইয়াছে। তাহার বাড়ী এখন অট্টালিকা। বিনোদপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী দু'চারিখানি গ্রামের অনেক দরিদ্রের জমা-

জমিই তাহার হস্তে আসিয়াছে। গ্রাম্য লোকের অনেকেই পরোক্ষে এখনও ভৈরব কয়াল বলিয়া তাহার নামোল্লেখ করিলেও সমক্ষে সকলেই প্রায় ভৈরব বাবু বলিয়া থাকে। বামনদাস দুই বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারই নিকট হইতে এক শত টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। এখন তাহা সুদে আসলে প্রায় দেড়শত টাকা হইয়াছে। মধ্যে ভৈরববাবুর সহিত বামন-দাসের কিছু মনোমালিন্য হইয়া গিয়াছে। পারিবারিক কোন এক বিষয়ে ভৈরব তাঁহার নিকট হইতে এক শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবস্থা আদায় করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হন নাই। এই ঘটনার পর হইতেই বামনদাস মনে করিতেছিলেন, ভৈরবের টাকাগুলি শোধ করা অতি শীঘ্র কর্ত্তব্য। এবার তিনি শারদীয়া পূজার কিছু পূর্ব্বেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহ বড়ই সমৃদ্ধিশালী জেলা। এখানে যত ধনী জমিদার বাস করেন, বাঙ্গালার অন্য কোন জেলায় বোধ হয় তত নাই। জমিদারদের মধ্যে অনেকেই পূজার সময়ে সমাগত ব্রাহ্মণ-দিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিদায় দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ব্রাহ্মণ ময়মনসিংহ সহরে এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে সঙ্গতিপন্ন হিন্দু সন্তানদিগের নিকট যাচ্ঞা করিয়াও কিছু কিছু অর্থ প্রাপ্ত হন। বামনদাস পূর্ব্বে দু'একবার মাত্র ময়মনসিংহে গিয়াছেন, এবং জমিদার বাড়ী হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন; অন্যরূপ ভিক্ষা করেন নাই। জমিদারদিগের বাড়ীতে শাস্ত্রীয় বিচার ব্যাখ্যা প্রভৃতি হয়, এবং যাহার যেরূপ শাস্ত্রপার-দর্শিতা, তিনি সেইরূপ বিদায় পাইয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা এরূপ বিদায় বড়ই শ্লাঘ্য মনে করেন। অবস্থানুসারে বামনদাস এবার ভিক্ষা করিবেন কৃতসংকল্প হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ পঁহুছিতে বামনদাসের সাতদিন সময় লাগিয়াছিল। ময়-মনসিংহ সহরে কতকগুলি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে

কেহ কেহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ; আর কেহ কেহ পৌরোহিত্য করিতেন। স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকে দুটি অন্ন দিতে ইঁহাদের কেহই কুণ্ঠিত নহেন। বামনদাস ইঁহাদের এক জনের বাসায় অতিথি হইলেন।

পূর্ব্বে কখনও ভিক্ষা করেন নাই বলিয়া বামনদাসের ভিক্ষায় বাহির হইতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকিতে লাগিল। প্রাতঃস্নান সমাপ্ত করিয়া একখানি নামাবলি গায়ে দিয়া তিনি বাসা হইতে বাহির হইলেন, এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া একজন ব্রাহ্মণের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলেন। অভ্যস্ত ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভিক্ষায় উপাসনার বিশেষ প্রয়োজন। একস্থানে কয়দিন যাইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। যেরূপ উত্তর পাইবেন, তাহা হইতেই বুঝিতে হইবে, পুনরাগমনে ফল হইবে কি না। অনেকের মুখের কথা রুক্ষ হইলেও অন্তর ভাল, এবং দানের প্রবৃত্তি আছে। কেহ কেহ খুব মুখের মিষ্টতা দিয়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিবেন। যাহারা সহরের নিত্য অধিবাসী, অর্থবান হিন্দু, তাহাদের নিকট প্রায়ই কিছু কিছু পাইবেন। ইংরাজীজানা রাজ-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে দুই একজন ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মেজাজ চড়া। তাহারা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহেন বলিয়া ইঁহাদের সম্বন্ধে লোকের অভিজ্ঞতা অল্প। নিরাশ হইবার আশঙ্কা থাকিলে, ইঁহাদের বাসাতেই প্রথমতঃ যাওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিজেই শেষে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন, ইত্যাদি। বামনদাস প্রথমেই একজন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভৃত্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, বাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া চা পান করিতেছেন। বামনদাস বাহিরে কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন ; ভাবিলেন, চা পান শেষ হইলেই দর্শনের প্রশস্ত সময় হইবে। বাবু কি বলিয়া উঠেন, কেবল এই ভাবনাই তাঁহার মনে আসিতে লাগিল। বাবুর চা পান শেষ

হইলে বামনদাস সাহসে ভর করিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং অতি বিনীত ভাবে কহিলেন,—"ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ।" গৃহস্বামীর মেজাজ ভাল ছিল না। তিনি রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন,—"এখানে কিছু হবে টবে না। অন্যত্র দেখুন।" বামনদাস বাক্যব্যয় না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় এক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াও তিনি ফললাভ করিতে পারিলেন না। সেখানে বাবু বাক্যের সহিত কিছু বিদ্রূপ মিশ্রিত করিয়া কহিলেন,—"আমরা নিজেরাই ভিক্ষার্থী, বিদেশে চাকরী করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করি। ভিক্ষা দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। জমিদারদের বাড়ীতে যান।" তৃতীয় বাসায় যাইয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সেখানে দুইটি বাবু একত্র বসিয়া আছেন; কে গৃহস্বামী, কে আগন্তুক চিনিতে না পারায়, বামনদাস উভয়ের নিকটেই প্রার্থনা জানাইলেন,—"শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে কিছু ঋণী হইয়াছি। সেই ঋণ হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত আপনাদের দ্বারস্থ।" বাবুদ্বয় বিরক্ত হইয়া,—"যান, অন্য সময়ে আসবেন, দেখা যাবে"। বামনদাসের সাক্ষাতে এইমাত্র বলিয়া তিনি বাহির হইতেই একজন আর এক জনকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'এ যায়গাটির এই এক ভয়ানক দোষ। পূজা আসিতেছে—এত ব্রাহ্মণ আসিয়া বিরক্ত করিবে—আর তার সময় নাই অসময় নাই, স্থান নাই অবস্থান নাই, আপনি এসেছেন বেড়াতে—সে জ্ঞান নাই—"ইত্যাদি। কথাগুলি বামনদাসের কানে গেল। অন্য স্থানে যাইতে আর তাঁহার পা উঠিল না। মনে করিলেন, আজ আমার যাত্রাই খারাপ হইয়াছে। কাল আর এক জনের সঙ্গে বাহির হইব। বামনদাস বাসায় ফিরিলেন। বাসায় আসিয়া শুনিলেন, বাড়ী হইতে তাঁহার একখানি চিঠি আসিয়াছে। চিঠি খুলিয়া পড়িয়াই ব্রাহ্মণ মর্ম্মাহত হইলেন। যেখানে দাঁড়াইয়া চিঠি খুলিয়াছিলেন, সেই

খানেই বসিয়া পড়িলেন। পত্রের মর্ম্ম পরের অধ্যায়ে পাঠককে জানাইতেছি।

৩

যে ভৈরব কয়ালের টাকার জন্য বামনদাস জীবনে আপনাকে প্রথম ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সেই ভৈরব টাকার জন্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে আদালতে এক ডিক্রী হাসিল করিয়াছেন। সেই অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রদানে অসম্মতি দিয়াই বামনদাস ভৈরবের কোপানলে পতিত হন। তিনি ভিক্ষার্থ ময়মনসিংহ যাইবেন, ভৈরব এ কথা শুনিয়াছিল; এবং তাঁহার গৃহত্যাগের সংবাদ পাইয়াই সে এক (অস্থাবর সম্পত্তির) ক্রোক বাহির করিয়া আনে। বামনদাস যে দিন বাড়ী হইতে বাহির হন, তাহার তিন দিন পরেই এক দিন বেলা এক প্রহর অতীত হইলে ভৈরবের লোকজন আদালতের পেয়াদা লইয়া তাঁহার বাড়ীতে আসে। বামনদাসের ব্রাহ্মণী তখন স্নানার্থে নিকটস্থ জলাশয়ে গিয়াছেন। বালক বালিকা বাড়ীতেই খেলা করিতেছে। ছাত্রেরা পূজার সময়ে সকলেই বাটী চলিয়া গিয়াছে। অন্য লোক কেহই নাই। সহসা এতগুলি লোকের আগমন দেখিয়া প্রিয়নাথ তাহার জননীকে সংবাদ দিতে গেল। ভৈরবের লোকগুলি পেয়াদা সম্মুখে রাখিয়া গৃহের যথাসর্ব্বস্ব বাহির করিয়া উঠানে আনিয়া রাখিতে লাগিল। কমলা বালিকা হইলেও "তোমরা কি কর কি কর?" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। এমন সময়ে তাহার জননী এবং অগ্রজ ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণী বাড়ীর পশ্চাদ্দিক দিয়া প্রবেশ করিলেন। ভৈরবের একটি লোক সে দিকে দাঁড়াইয়া ছিল। সে দেখিল, আর্দ্রবস্ত্রাবৃত ব্রাহ্মণীর কক্ষে একটি পিত্তলের কলসী, এবং দক্ষিণ হস্তে একটি ক্ষুদ্র চুপড়ীতে রন্ধনের নিমিত্ত প্রক্ষালিত তণ্ডুল রহিয়াছে। সে কহিল,—'ও গুলি নাবান্।' বামনদাসের গৃহিণী বাক্য-

ব্যয় না করিয়া জলের কলসী ও চালের চুপড়ীটি মাটীতে রাখিয়া দিলেন। ভৈরবানুচর জল ঢালিয়া কলসীটি এবং চালশুদ্ধ চুপড়ীটি আনিয়া বাহির বাটীতে হাজির করিল। ব্রাহ্মণী স্তম্ভিত হইলেন। সেই আর্দ্রবস্ত্রেই শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন, গৃহ একেবারেই শূন্য।-কিছুই নাই। বাহিরে সমাগত লোকদিগের মধ্যে তাঁহার নিকট প্রতিবেশী দ্বিজপদ ভট্টাচার্য্যকে দেখিতে পাইলেন এবং প্রিয়নাথকে দিয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন। দ্বিজপদ বামনদাস অপেক্ষাও নিরীহ। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন,—'একি? একি?' দ্বিজপদ উত্তর করিলেন,—'ভৈরব কয়ালের যে টাকা ধারিতেন, তাহারই জন্য এই সব লইয়া যাইতেছে। বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিবে।' বামনদাস গৃহিণী পুনরায় কহিলেন,—'ঘরের চাল ডাল সকলই নিয়াছে। পরিবার কাপড় খানিও রাখে নাই। উঁহারই টাকার জন্যে এবার ভিক্ষা করিবেন বলিয়া গিয়াছেন। পূজার সময়ে বাড়ী আসিয়া বোধ হয় টাকা শোধ করিতে পারিতেন। উহাদের বলিলে কি এই কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে পারে না?' দ্বিজপদ কহিলেন,—'আমরা সকলেই বলিয়াছিলাম। ভৈরবের ছেলে—সেত প্রিয়নাথের কিছু বড়, সেই তাকে কত বলেছে. তা কিছুতেই শুনে না।' ব্রাহ্মণীর আর বাক্য সরিল না। প্রিয়নাথ ও কমলা তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। দ্বিজপদ তাহাদিগকে ভুলাইয়া নিজের বাটীতে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে মধ্যাহ্নের আহারের ব্যবস্থা করিলেন। আহারের সময় কমলা মার জন্য কাঁদিতে লাগিল। দ্বিজপদের মাতা ভগ্নী প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী কিছুতেই আহার করিতে সম্মত হইলেন না, এবং গৃহত্যাগ করিলেন না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি সেই আর্দ্রবস্ত্রেই কাটাইলেন। রাত্রিতে তাঁহার শরীরে প্রবল জ্বর দেখা দিল। জ্বরের অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া কেবল সেই ক্রোকের কথা

বাহির হইতে লাগিল।—'ভাতের চালগুলি আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। কাঁকালের কলসীটার জল ফেলে দিয়ে নিয়ে গেল।' কেবল এইরূপ কথাই তিনি বলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্প। আর্দ্রবস্ত্রে বাড়ী আসিয়া অবস্থা দেখিয়াই তাঁহার হৃৎকম্প হইয়াছিল; তাহা আর কমে নাই। তাঁহার স্বভাবগুণে প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণ-কন্যাগণ সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। এই বিপদের দিনে অনেকেই আসিলেন। ব্রাহ্মণী কেবল বলিতে লাগিলেন,—'আমার বুকের কাঁপুনিটা কমিল না। যে ক'দিন ইনি বাড়ী না আসেন, তোমরা আমার প্রিয়নাথকে দেখিবে, আমাকে দেখবার দরকার নাই।'

প্রতিবেশী দ্বিজপদ এই সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিয়া বামনদাসের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। সেই চিঠি পাইয়াই বামনদাস হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহা উক্ত হইয়াছে।

বামনদাস যে দিন ভৈরবের অত্যাচারের সংবাদ পাইলেন, সেই দিনই বাটি যাত্রা করিলেন। বাটীতে যাইয়া কি দৃশ্য দেখিব, পথে কেবল এই ভাবনাই তাঁহার মনে আসিতে লাগিল। বামনদাস সাত দিনে ময়মনসিংহে পঁহুছিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁচ দিনেই তিনি বাড়ী আসিলেন। পথে তিনি অল্পই বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণী শয্যাগতা। তাঁহার পার্শ্বে প্রতিবেশিনী দুই একজন রহিয়াছেন। গৃহ মধ্যে দ্রব্য সামগ্রী কিছুই নাই। একটি মৃৎপাত্রে পানীয় জল রহিয়াছে। ব্রাহ্মণীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন। তাঁহার কথা কহিতেও কষ্ট হয়। ব্রাহ্মণী স্বামীকে দেখিয়াই চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। বামনদাসেরও চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। গ্রামের এক কবিরাজ ব্রাহ্মণীকে দেখিতেছিলেন। বামনদাসের আগমনের কিছু কাল পরেই তিনি আসিলেন, এবং রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—'পীড়া ক্রমশঃ কঠিন

হইয়া উঠিতেছে।' বামনদাস ব্যাকুল হইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিগণ ও চিকিৎসক সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার মনোবেগ আরও বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার মনে হইল, ব্রাহ্মণী কিছুতেই বাঁচিবেন না; আর তিনিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। যদি তিনি এরূপ অসহায় অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে এমন হইত না; এইরূপ বিবিধ চিন্তা তাঁহার মনে আসিতে লাগিল।

সন্ধ্যাসমাগমে প্রতিবেশীরা একে একে বাড়ী যাইতে লাগিলেন। চিকিৎসক রাত্রির ঔষধ ও শুশ্রূষার উপদেশ দিয়া বিদায় হইলেন। ব্রাহ্মণীকে একাকিনী পাইয়া বামনদাস কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী 'কাঁদ কেন, কাঁদ কেন?' বলিয়া প্রশ্ন করায় কহিতে লাগিলেন, 'আমিই ত তোমাকে মারিয়া ফেলিলাম।' 'তোমার কি দোষ?' বলিয়া গৃহিণী স্বামীর চরণে হস্ত স্পর্শ করিলেন, এবং কহিলেন, 'তুমি এসেছ, আর আমার মরিতে ভয় নাই। এত দিন মন বড়ই খারাপ ছিল। তোমার পায়ে মাথা রেখে মর্‌তে পার্‌লে আর ভাবনা কি? ঠাকুরঝিকে খবর দিয়াছি, একবার এলে হ'ত। তাঁর হাতে প্রিয়নাথ আর কমলাকে দিয়া যেতাম্‌।'

বামনদাসের এক ভগিনী ছিলেন। বিক্রমপুরে তাঁহার বিবাহ হয়; তিনি বিধবা। পুত্র কন্যা তাঁহার কিছুই নাই। প্রিয়নাথ ও কমলাকে তিনি বড়ই ভালবাসেন। ব্রাহ্মণী তাঁহারই কথা বলিতেছিলেন।

বামনদাস ব্রাহ্মণীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া পুনরায় কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন,—'তুমি নিশ্চয়ই চলিলে। আশীর্ব্বাদ করি, পুনরায় যদি নারীজন্ম পাও, যেন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গৃহিণী না হও।' ব্রাহ্মণী কহিলেন,—'যদি নারীজন্ম পাই, যেন তোমাকেই পতিলাভ করি। এক

দিনের তরে তোমার মুখে একটি অপ্রিয় কথা শুনি নাই। আমার কাজ কর্ম্ম রাঁধা বাড়া সকল বিষয়েই তুমি চিরসন্তুষ্ট।'

ব্রাহ্মণী আর কথা কহিতে পারিলেন না। বক্ষে ও পার্শ্বে ভয়ানক বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। বামনদাস যথাসাধ্য শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ব্রাহ্মণীর তন্দ্রার ন্যায় একটু নিদ্রা আসিল। বামনদাসও পার্শ্বেই অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় ছিলেন। সহসা ব্রাহ্মণীর চীৎকার শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন,—'ঐ আবার কয়ালের লোক আস্‌ছে।' বামনদাস জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কৈ কয়ালের লোক?' ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন,—'ঐ যে দেখ্‌তে পাচ্ছনা?' 'এখানে কেউ নাই' বলিয়া বামনদাস তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। ব্রাহ্মণীর তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। কহিলেন,—'দেখ, একটা কথা বলা হয় নাই। কয়ালের দেনাটা যত শীঘ্র পার, শোধ করো। সেই দিন থেকে যেমনই একটু তন্দ্রা আসে, অমনই কেবল কয়ালের লোকই দেখি। ধোয়া চালগুলি হাত থেকে নিয়ে গেল। বাছাদের মুখে আর আমি রেঁধে অন্ন দিই নাই। উঃ'—বামনদাসের বুক ফাটিয়া গেল। তিনি কহিলেন,—'কা'লই আমি জমি বেচে হ'ক বা যেমন করে হ'ক ওর দেনা শোধ করে ফেলবো। তুমি সুস্থ হও।' ব্রাহ্মণী আর সুস্থ হইলেন না; প্রলাপ বকিতে বকিতে তাঁহার রাত্রি কাটিল। মধ্যে মধ্যে জ্ঞান, আর মধ্যে মধ্যে প্রলাপ। প্রলাপের উক্তি প্রায়ই ভৈরবের ক্রোক সম্বন্ধে। 'ওগো ঐ কয়ালের লোক এলো, সব নিয়ে গেল, তা যা'ক, আমার ছেলে মেয়ে দু'টিকে একটু সাবধানে রেখো, ওরা বড় ভয় পায়, ওদের যেন ধরে না।' ব্রাহ্মণীর মুখে কেবল এইরূপ কথাই বাহির হইতে লাগিল।

পর দিন প্রভাতে যে দেখিল, সেই বলিল, আজ ইঁহার অবস্থা বড়ই খারাপ। মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বামনদাসের ভগ্নী আসিয়া পঁহুছিলেন।

ভ্রাতৃজায়ার নিকটে গেলেই তিনি তাঁহার হাত দুখানি ধরিলেন, এবং আপনার পুত্রকন্যাকে ডাকিলেন। প্রিয়নাথ ও কমলার ক্ষুদ্র হাতগুলি লইয়া তাহাদের পিসীমার হাতে রাখিয়া কহিলেন,—'ঠাকুর ঝি! আমি ত চলিলাম; উনি যে আর সংসারে থাকিবেন, বোধ হয় না; তোমার পেটে কিছু হয় নি. এদের তুমি বড় ভাল বাস। তুমিই এদের মানুষ করো। প্রিয়নাথ কমলাকে তোমার হাতে দিয়া যাব,—এই আমার ইচ্ছা ছিল।' ব্রাহ্মণীর চোক দিযা দরদরধারে জল পড়িতে লাগিল। প্রিয়নাথ ও কমলা বড়ই কাঁদিতে লাগিল। বামনদাসের ভগ্নীও অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পার্শ্বে দাঁড়াইযা বামনদাসও এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রতিবেশী যাঁহারা নিকটে ছিলেন, তাঁহারাও কাঁদিলেন।

সেই দিন অপরাহ্ণে বামনদাসের ব্রাহ্মণী পতি পুত্রকন্যা সম্মুখে রাখিয়া আপনার ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে, দিব্যজ্ঞানে দেহত্যাগ করিলেন; দরিদ্রতার নিপীড়ন অপমান ও লাঞ্ছনা হইতে এ জন্মের মত নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

৪

অল্পকাল মধ্যেই প্রতিবেশী ব্রাহ্মণেরা মৃত দেহের সংকারের উদ্যোগ করিল, এবং শব স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে লইয়া চলিল। বামনদাস ও প্রিয়নাথ শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে চলিলেন। কমলা তাঁহার পিসীমার কাছে বাড়ীতে রহিল। কিন্তু তাহাকে রাখিতে তাহার পিসী ও প্রতিবেশিনী দুই একটি ব্রাহ্মণ কন্যার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। পাঁচ বৎসরের বালিকা যখন সরল অথচ কাতরভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিল, মাকে অমন করে বাঁধলো কেন? মাকে ওরা কোথায় নিয়ে যায়? মা কখন ফিরে আসবে? তখন সমাগত নারীগণ সকলেই আপন আপন চক্ষের জল চাপিয়া রাখিয়া দু'একটি মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা

করিয়া ছিলেন। কিন্তু সে যখন শেষে আবদার আরম্ভ করিল,—'দাদা, বাবা মা'র সঙ্গে গেল—আমিও যাই, পিসীমা তুইও চল,' তখন বামনদাসের ভগ্নী অতি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কমলা হয় ত কারণ না বুঝিয়াই পিসীর কান্নায় যোগ দিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া বালিকা যেন আপন মনে কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল,—'মা যদি না আসে, আমি পিসীমার কাছে থাক্‌ব' এই বলিয়া সে তাহার পিসীমার ক্রোড়ে মস্তক লুকাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল; অল্পক্ষণেই সে নিদ্রার আশ্রয় পাইল। পিসীমা বালিকার চক্ষু হইতে বিগলিত শেষ অশ্রুবিন্দু সযত্নে মুছাইয়া দিয়া একখানি বস্ত্র পাতিয়া তাহাকে শয়ন করাইলেন। পুত্রধনে বঞ্চিতা রমণীর অন্তঃকরণ সেই মুহূর্ত্তেই যেন মাতৃস্নেহে ভরিয়া গেল। তিনি পুনঃ পুনঃ কমলার মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। বালিকার মুখে দু' একটি মাছি বসিতেছিল, অঞ্চল দ্বারা তাহা তাড়াইতে লাগিলেন।

যাঁহারা শৈশবে মাতৃহীন হইয়া অপত্যহীনা পিসী কিংবা মাসীর স্নেহে পালিত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, জগতে ইহাদের স্নেহও সামান্য নহে।

প্রিয়নাথ ও তাহার পিতার শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল। বামনদাস আসিয়াই ভগ্নীকে কহিলেন,—'আমার জ্বর হইয়াছে।' ভগ্নী শিহরিয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন,—'বালাই, জ্বর হয় নাই। মনের কষ্টে শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে।' ভ্রাতা পুনরায় বলিলেন যে, বাস্তবিকই তাঁহার জ্বর হইয়াছে। ভগ্নী তখনও যেন তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। পল্লীগ্রামের অনেকের মনে ধারণা, কাহারও সৎকার করিতে যাইয়া শ্মশান হইতে জ্বর লইয়া আসিলে সে জ্বর প্রায়ই সাংঘাতিক অথবা দুরারোগ্য হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসের জন্যই বামনদাসের ভগ্নী ভ্রাতার জ্বরের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ তাহা

উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু শেষে যখন অগ্নিস্পর্শ ইত্যাদি করিয়া বামনদাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার গায়ে হাত দিয়া তিনি বড়ই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বামনদাসের শরীর বিলক্ষণ গরম হইয়াছিল। তিনি শীতে কাঁপিতেছিলেন। ঘরে শয্যা অতি অল্পই ছিল। যে সামান্য গাত্রবস্ত্র ছিল, তাহা সমস্ত ব্যবহার করিয়াও বামন দাসের শীত ভাঙ্গিল না। তিনি কহিলেন,—'দিদি আমার জন্য বারাণ্ডায় একটু আগুন করিয়া দাও।' অগ্রজা তাহাই করিলেন।

প্রিয়নাথ কমলার পার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বামনদাস ও তাঁহার ভগ্নী সে রাত্রি প্রায় জাগিয়াই কাটাইলেন। মধ্য রাত্রে বামনদাস একবার ভগ্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'সেত বলেই গেছে—আমিও বলে যাই, প্রিয়নাথ ও কমলা তোমারই। তোমাকেই ওদের মানুষ কর্ত্তে হবে। ছেলেটা বাঁচলে বাবার নামটা থাকবে, পূর্ব্ব পুরুষেরা এক এক গণ্ডূষ জল পাবেন।' তাঁহার দিদি কহিলেন,—'ওকি কথা? জ্বর হয়েছে—সেরে যাবে।' 'না দিদি, এ জ্বর সারিবার নয়' বলিয়া সংক্ষেপে উত্তর করিয়াই বামনদাস যেন তন্দ্রাভিভূত হইলেন।

পর দিন প্রভাতে প্রতিবেশীরা সকলেই পরামর্শ দিল, বামনদাস কিছুদিন তাঁহার ভগ্নীর বাটীতে গিয়া থাকুন। ভগ্নীরও সেই মত হইল। সেই দিনই বামনদাস ভৈরব কয়ালের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন। তাঁহার ব্রহ্মত্র জমির অনেকটা বিক্রয় করিতে হইল, ভৈরবই তাহা ক্রয় করিলেন। ক্রোকের দ্বারায় ভৈরব অতি অল্প মূল্যের দ্রব্যাদিই পাইয়াছিলেন। তাহাতে মোকদ্দমার ব্যয়ও শোধ হয় নাই। সুতরাং ঋণের টাকা সমস্তই জমি বেচিয়া দিতে হইল। বামনদাস তাঁহার সর্ব্বস্ব দিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

ইহার পরদিনই তাঁহারা সকলে বিক্রমপুর যাত্রা করিলেন। বামন-

দাসের বাড়ীখানি খালি পড়িয়া রহিল। একমাস পূর্ব্বে যে ভবন বালক বালিকা ও ছাত্রগণের কোলাহলে পূর্ণ ছিল, আজ তাহা নীরব ও জনশূন্য হইল। নৌকায় উঠিবার পূর্ব্বে বামনদাস একবার শূন্য গৃহের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন; তাঁহার গণ্ড দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। প্রতিবেশী দ্বিজবরকে কহিলেন,—"ছাত্রেরা কেহ আসিলে আমার অবস্থা ও আশীর্ব্বাদ জানাইও। আর আমি এ জীবনে বোধ হয় কাকেও পড়া'ব না। এখন নিজের পরকালের পড়া কিছু পড়্‌তে পারিলে হয়। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তারা যেন সকলেই মানুষ হয়; আর বিনা ক্লেশে উদরান্নের সংস্থান কর্ত্তে পারে।"

বাড়ী ছাড়িবার তিন দিন পরে বামনদাস ভগ্নীর আলয়ে পঁহুছিলেন। ভগ্নী প্রাণপণে ভ্রাতার শুশ্রূষা করিলেন, গ্রাম্য কবিরাজ দ্বারা যথাসাধ্য চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু রোগের উপশম হইল না। পীড়ার আরম্ভ হইতেই বামনদাস জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না বলিয়া তাঁহার বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা বলেন, এইরূপ বিশ্বাসে মানুষের জীবনাশক্তির হ্রাস হয়। মাতার মৃত্যুর পর পনের দিনের মধ্যেই প্রিয়নাথ ও কমলা পিতাকেও হারাইল। পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকার আশ্রয়স্থল একমাত্র পিসীমা রহিলেন।

প্রিয়নাথ ও কমলার মুখের দিকে চাহিয়া বামনদাসের ভগ্নী যেন ভ্রাতৃ-শোকও ভুলিয়া গেলেন। কেমন করিয়া উহাদিগকে মানুষ করিব, এই চিন্তাই তাঁহার মনে প্রবল হইল। তাঁহার স্বামীর যে সামান্য জমি জমা ছিল, তাহাতে কথঞ্চিৎ তিনটি প্রাণীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে পারিত; কিন্তু পিসীর ভাবনা হইল, প্রিয়নাথের শিক্ষা লইয়া। কমলার বিবাহের, এখনও বয়স হয় নাই।

প্রিয়নাথ বাড়ীতে পিতার নিকট সামান্য সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিল।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অনেকটা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। বামনদাস ও তদীয় পূর্ব্ব-পুরুষেরা সকলেই পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া পিসীর বড়ই ইচ্ছা, প্রিয়নাথকে সংস্কৃত পড়ান্। কিন্তু তাঁহার বাসগ্রামে টোল ছিল না। বাড়ীর নিকটে জমিদার হরদেব ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। পিসীমা প্রিয়নাথকে সেই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন।

হরদেব ভট্টাচার্য্যের একটি মাত্র পুত্র। তাহার নাম চারুচন্দ্র। হরদেব প্রধানতঃ চারুচন্দ্রের শিক্ষার জন্যই বাড়ীতে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। প্রিয়নাথের পিসী হরদেবের সহিত কথা কহিতেন না। তিনি তাঁহার দূর সম্পর্কীয় দেবর। তিনি এক দিন চারুচন্দ্রকে ডাকাইয়া কহিলেন,—"বাবা চারু! তোমাদের বাড়ীর স্কুলে আমার প্রিয়নাথকে পড়িতে দিতে চাই—উহার মা বাপ কেহই নাই, তোমার বাবা আমার অবস্থা সমস্তই জানেন। তিনি কত গরীবের সাহায্য করেন। তুমি আমার হইয়া বলিও, যেন আমার প্রিয়নাথকে মানুষ করিয়া দেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, চিরদিন তোমাদের নাম করিবে।"

চারুচন্দ্র প্রিয়নাথ অপেক্ষা ২।৩ বৎসরের বড়। চারুর স্বভাব বড়ই নির্ম্মল, বড়ই উদার। এই অল্প বয়সেই তাহার বালকত্ব ঘুচিয়া গিয়াছিল, এবং মনুষ্যত্ব জন্মিয়াছিল। প্রিয়নাথের পিতার পীড়ার সময় চারু কয়েক দিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। বামনদাসের মৃত্যুর পর হইতেই প্রিয়নাথের প্রতি তাহার কেমন একরূপ মমতা জন্মিয়াছিল। চারু বলিল,—"জ্যেঠাই মা! প্রিয়নাথের পড়ার জন্যে তোমাকে ভাবিতে হইবে না। আমাদের বাড়ীর স্কুলে যতদূর পড়া হয়, ও তাহা অনায়াসে পড়িতে পারিবে। ইহার পরেও উহার পড়ার বন্দোবস্ত যাহাতে হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিব। আমি আজই যাইয়া বাবাকে বলিব।"

চারুর কথা শুনিয়া প্রিয়নাথের পিসী বড়ই আহ্লাদিত হইলেন, এবং কহিলেন,—"বাবা তোমার যেমন মন, তুমি রাজ্যেশ্বর রাজা হবে, চিরদিন সুখে থাক্‌বে, তোমার ছোট ভাই বোন থাকিলে তাদেরও ত ভাল বাসিতে, প্রিয়নাথ কমলাকে সেই ভাবে দেখিও।"

রমণীর গণ্ড দিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। "জ্যেঠাইমা কেঁদ না" বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া চারু বাড়ী ফিরিয়া গেল।

৫

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চারুর স্বভাব বড়ই উদার। সংসারের সমস্ত লোককেই, বোধ হয়, উদার ও অনুদার, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উদার-স্বভাব লোকেরা সরল, অনুদার স্বভাবের লোক চতুর। উদারস্বভাবের লোকেরা আত্মসুখের অন্বেষণ করেন না। ইহারা আপনার দ্রব্য পরকে দিয়া তৃপ্তি অনুভব করেন। অন্যের ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে ইঁহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমার একটি ভাল জিনিসে অন্যের প্রয়োজন হইয়াছে জানিতে পারিলে, ইঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা বিসর্জ্জন দিতে পারেন, অথচ অন্যের কিছুতে ইঁহাদের লোভ হয় না। অনুদার স্বভাবের লোক সাধারণতঃ অন্যের জিনিসটি আত্মসাৎ করিতেই ইচ্ছুক, অথচ নিজের কিছু থাকিলে অন্যের প্রয়োজন শুনিলেই হয় ত তাহা লুকাইয়া রাখে; পরের দোষ দেখিলেই ইহারা শতমুখে তাহার কীর্ত্তন করিতে থাকে, এবং দানের শক্তি থাকিলেও প্রার্থীর দোষ অন্বেষণ করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করে।

কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন,—'শিশুই (পূর্ণবয়স্ক) মানবের জনক।' ইহার অর্থ এই যে, মানুষ কে কেমন হইবে, শৈশবেই তাহার আভাস পাওয়া যায়; কেন না, সেই সময়েই তাহার মানসিক প্রবৃত্তিগুলি গঠিত হইতে ও স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। এই জন্যেই বালক বালিকাদিগের

মধ্যেই আমরা এই উদার ও অনুদার স্বভাব দেখিতে পাই। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, একই বয়সের দুই প্রতিবেশী বালকের মধ্যে হয় ত এক জন উদার ও একজন অনুদার স্বভাবের। প্রথমোক্ত বালক একটু খাবার দ্রব্য পাইলে দ্বিতীয়কে না দিয়া খাইবে না, তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে; দ্বিতীয় বালকটি এমন অবস্থায় যাহাতে প্রথমের সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তাহারই চেষ্টা করিবে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ৮।১০ বৎসর-বয়স্ক দুইটি সহোদর ভাই একই পুস্তক পড়ে। ছোটটি নিজের পুস্তক-গুলি তুলিয়া রাখিয়া প্রায়ই বড়টির পুস্তক গুলি ব্যবহার করে। বড় ভাইয়ের একখানি পুস্তক ছিঁড়িয়া গিয়াছে, অথচ ছোটটির সেই পুস্তক প্রায় নূতন রহিয়াছে। বড় ভাই কখনই আপত্তি করিত না। ছিন্ন পুস্তক দেখিয়া এক দিন কহিল,—"ছি ভাই! তুমি নিজের বই থাকতে সব সময়ে পরের বই নাও কেন?" চতুর অনুজ অনায়াসে উত্তর করিল,—"তুমি কি আমার পর? তুমি ত আমার বড় ভাই।"

ইহাদের মধ্যে বড়টি উদার, আর ছোটটি অনুদার, ইহা বলিবার প্রয়োজন আছে কি?

তাই বলিতে ছিলাম, চারু বালক হইলেও তাহার উদারতা ছিল। তাহার যেমন স্বভাব, তাহাতে প্রিয়নাথের সম্বন্ধে তাহার পিসীমার অনুরোধের প্রয়োজন ছিল না। চারু আপনিই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকা দরিদ্রা পিতৃস্বসার ভবনে অবস্থান করিতেছে,—কিছুমাত্র সম্পর্ক না থাকিলেও ইহারা সাহায্যের পাত্র। প্রিয়নাথ কমলাকে তিনি ঠিক তাঁহার ছোট ভাই ভগ্নীর মত দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কথায় হরদেব অতি সহজেই প্রিয়নাথের পুস্তকাদির মূল্য ও বিদ্যালয়ের বেতন দিতে সম্মত হইলেন।

প্রিয়নাথের পিসীর বাড়ী চারুদের বাড়ী হইতে অধিক দূরে নহে।

প্রিয়নাথের প্রতি চারুর ভালবাসা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে প্রায়ই এক সঙ্গে থাকিতেন। চারুর অনুরোধে প্রিয়নাথকে অনেক দিন তাঁহার বাড়ীতেই আহার করিতে হইত। প্রাতঃকালে দুই জনেই এক সঙ্গে পড়িতেন, স্নান করিবার সময়ে চারু প্রায়ই প্রিয়নাথকে ছাড়িয়া দিতেন না। সন্ধ্যার পরেও উভয়ে চারুর ঘরে বসিয়া পাঠাদি অভ্যাস করিতেন, প্রিয়নাথের পিসী প্রিয়নাথকে ডাকিতে আসিলে চারু প্রায়ই বলিতেন,—"ও আমার সঙ্গে খেয়ে আমার কাছেই শুয়ে থাকবে এখন।" জ্যেঠাইমা ফিরিয়া যাইতেন।

প্রিয়নাথের পিসীর বাড়ীর নিকটে চারুদের একটি ফলের বাগান ছিল। গ্রীষ্মকালে চারু প্রায়ই প্রিয়নাথকে সঙ্গে লইয়া আম লিচু কাঁঠাল ইত্যাদি পাড়িতে যাইতেন। ফলগুলি পাড়া শেষ হইলে চারু প্রত্যহই ঝাঁকার ভাল ভাল আম ও বড় বড় লিচু কতকগুলি জ্যেঠাইমাকে দিয়া আসিতেন। জ্যেঠাইমা প্রায়ই বলিতেন,—"বাবা সব ভাল আম গুলি দিয়ে গেলে?" চারু বলিতেন,—"তা হউক, ঝাঁকায় ঢের আছে। তুমি আমগুলি প্রিয়নাথ ও কমলাকে দিবে ও নিজে খাবে।"

দানের প্রতিদান স্বাভাবিক, ভাল বাসিলে ভালবাসা—পাওয়া যায়। তুমি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র, তুমি ধনী, আমি দরিদ্র, তুমি দাতা, আমি গ্রহীতা। তুমি আমাকে দয়া করিতে পার, দান করিতে পার, আমার দুঃখ দূর করিতে পার, আমি প্রত্যক্ষ কিছু করিতে না পারিলেও তোমাকে অকৃত্রিম ভক্তি ভালবাসা উপহার দিতে পারি। প্রিয়নাথ ও কমলাকে চারু ভাল বাসিতেন, দয়া করিতেন, দান করিতেন; তাহারা ভাই ভগ্নী হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত দাসদাসীর ন্যায় তাহার সেবা করিত। প্রিয়নাথ তাঁহাকে বস্তুতঃই প্রভুর ন্যায় সম্ভ্রম করিতেন। কমলা বালিকা, তথাপি সে চারুর দয়া বুঝিতে না পারিত, এমন নহে, এবং

সর্ব্বদাই দেখাইত যে, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় চারুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।

সংসারে অতি পাষণ্ড ব্যতীত বোধ হয় সকলেরই প্রাণে উপকারীর সেবা করিবার একটি স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে। প্রিয়নাথের পিসী মধ্যে মধ্যে প্রায়ই সামান্য সামান্য দ্রব্যাদি দিয়া চারুর তৃপ্তিসাধন করিবার চেষ্টা করিতেন। কখনও কিছু ভাল মিষ্টি, কখনও বা কিছু পিষ্টক স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তিনি প্রিয়নাথকে বলিতেন,—"বাবা! আজ বৈকালে চারুকে ডেকে এন।" উভয়ে আসিলে রমণী সেই সামান্য দ্রব্য দুই জনকে ভাগ করিয়া দিতেন; এবং চারুকে কহিতেন,—"খাও বাবা, সোণার হাতে যবের ছাতু।" চারু মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহা আহার করিতেন, কমলা নিবিষ্টমনে সম্মুখে বসিয়া থাকিত, এবং পিসীমার ব্যক্ত অনুরোধ ও দীনতার সহিত তার নিজের অব্যক্ত অনুরোধ ও দীনতা মিশাইয়া দিত। আহারের পর কিছুকাল গল্প স্বল্প করিয়া হয় ত প্রিয়নাথ ও চারু তাহাদের বাড়ীর দিকে যাইতেন। চারু তাঁহার হস্তিদন্ত খচিত যষ্টিখানি ফেলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া কমলা তাহা লইয়া পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিত,—"এই যে আপনার লাঠি।" চারু তাহার মুখে 'আপনার' শুনিয়া হাসিয়া উঠিতেন, এবং আহ্লাদে ঠিক আপনার অনুজার ন্যায় হয় ত তাহার গালটি টিপিয়া দিতেন। বালিকার প্রাণ এ আদরে গলিয়া যাইত। বস্তুতঃ সে চারুকে ঠিক দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত; ভাল বাসা কি, তাহা অবশ্য সে বুঝিত না; কিন্তু চারু যে তাহাদিগকে অতিশয় স্নেহ করেন, ইহা সে বিলক্ষণ বুঝিত, এবং অনেক সময় সে নীরবে তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। চারুর প্রত্যেক কার্য্য তাহার নিকট অতি মধুর এবং তাহার প্রতি কথাই তাহার নিকট অতি মিষ্ট বলিয়া বোধ হইত। চারু কোন কথা কহিলেই সে তাহা উৎকর্ণ হইয়া

শ্রবণ করিত এবং তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপ সে নিবিষ্টমনে লক্ষ্য করিত। সরলা বালিকা তাহার সহজ জ্ঞানেই যেন বুঝিয়া ফেলিয়াছিল, চারুর হৃদয়ে, বাক্যে, ব্যবহারে বা কার্য্যে কোনরূপ কুটিলতা বা অপবিত্রতা নাই।

৬

প্রিয়নাথ ও কমলা পিসীর বাড়ীতে আসিবার পর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পিসীমার বাৎসল্যে ও চারুর স্নেহে ভাই ভগ্নী অতি সুখেই কাল কাটাইতেছে। প্রিয়নাথ ও কমলা চারুর সহোদর সহোদরা হইলেও তিনি তাহাদিগকে এত অধিক যত্ন করিতে পারিতেন না। সহসা চারুর কঠিন পীড়া হইল। এই বৎসর তাঁহার কোষ্ঠীর ফল ভাল ছিল না বলিয়া পিতামাতা পূর্ব্ব হইতেই শঙ্কিত ছিলেন। চারুর রিষ্টিনিবারণার্থ শান্তি স্বস্ত্যয়নেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহার জ্বর দেখিয়া পিতামাতা উভয়ে বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া চারুর চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। চারুর যেরূপ জ্বর হইয়াছিল, তাহার ভোগ কাল ছয় সপ্তাহ। চারু পিতা মাতার একমাত্র সন্তান,—তাঁহার রোগ যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তেমনই হরদেব ও তাঁহার ব্রাহ্মণী দুশ্চিন্তায় অতিশয় বিষণ্ণ ও প্রায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। চারুর স্বভাবের গুণে গ্রামস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে ভাল বাসিত। পীড়ার বৃদ্ধির সময়ে অনেকেই আপন আপন কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত, এবং তাঁহার পিতামাতাকে সান্ত্বনা করিত। প্রিয়নাথ অহোরাত্র চারুর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকিত, এবং যতদূর সাধ্য, তাঁহার কষ্ট অপনোদনের চেষ্টা করিত। তাহার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। চিকিৎসক অথবা গ্রামের লোক যে যখনই আসিত, প্রিয়নাথকে চারুর শয্যাপার্শ্বে দেখিতে

পাইত। অন্যে জোর করিয়া তাহাকে স্নান আহার করাইত। চারু যখন তন্দ্রাবস্থায় বা নিদ্রাবস্থায় থাকিত, প্রিয়নাথ তখনই তাহার শয্যা প্রান্তে ঘুমাইয়া পড়িত।

এত যত্ন শুশ্রূষা ও চিকিৎসা সত্ত্বেও চারুর পীড়া ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিল। জ্বর হইবার চল্লিশ দিনের দিন তাহার ভয়ানক বিকারের অবস্থা হইল। এত দীর্ঘকাল অনাহারে থাকায় শরীর অতিশয় শীর্ণ ও কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছিল। গায়ে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে বিছানায় মানুষ আছে বলিয়া বুঝা যাইত না। এই অবস্থাতেও বিকারের জোরে চারু পুনঃ পুনঃ উঠিয়া বসিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন। যে দেখিল, সেই ভাবিল, জীবনের আশা অতি অল্প। হরদেব ও তাঁহার গৃহিণী ভূমিতে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। প্রিয়নাথ তখনও সংজ্ঞাহীন হয় নাই; সে চিকিৎসকের হস্ত দুইটি ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আপনি আপনার ঔষধের থলি ঝাড়িয়া একটা বড় ঔষধ দেন।" চিকিৎসক বিষ-বটিকা প্রয়োগ করিলেন। প্রিয়নাথ অতি কষ্টে সেই ঔষধ চারুর গলাধঃকরণ করাইলেন। চারু নিদ্রিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইলেন, ক্রমশঃ শরীর যেন অসাড় হইতে লাগিল, পা দুটি হিম হইয়া আসিল; চিকিৎসক হাতটি ধরিয়াই বসিয়া আছেন, নাড়ী আছে কি নাই, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। তিনি একটু মুখ বাঁকাইলেন। এইবার প্রিয়নাথও শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। একটা মহাকলরব উপস্থিত হইল, বাহিরে দুই এক জন লোক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল। সহসা চিকিৎসকের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গেল। তিনি অতিশয় আহ্লাদের সহিত কহিয়া উঠিলেন—"ঔষধ ধরিয়াছে, নাড়ী পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় এ যাত্রা বিপদ কাটিয়া গেল।"

ইহার পর চারু ক্রমশঃই আরোগ্যের পথে আসিতে লাগিলেন। অনেকেই বলিতে লাগিল, হরদেব ও তাঁহার ব্রাহ্মণীর পুণ্যবলেই পুত্র যমঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

চারু এখনও অন্ন পথ্য করেন নাই। কবিরাজ যে তেজের ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার দোষ নিবারণার্থ এখন চারু অনেক ঠাণ্ডা জিনিষ ব্যবহার করিতেছেন; চিকিৎসক দাড়িম্ব অথবা বেদানার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু অসময় ও পল্লীগ্রাম বলিয়া তাহা পাওয়া যায় নাই।

যে সময় দাড়িম্ব ও বেদানার কথা হয়, বালিকা কমলা তখন চারুর ঘরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সে প্রত্যহই চারুকে দেখিতে আসিত। ডালিম পাওয়া যায় নাই শুনিয়াই কমলা বাড়ী ফিরিয়া গেল, এবং কাহা-কেও কিছু না বলিয়া পিসীমার গৃহের উত্তরদিকে বাগানে প্রবেশ করিল। এই বাগানে একটি দাড়িম্বের গাচ ছিল। কমলা ইহার দুইমাস পূর্ব্বে দেখিয়াছিল যে, গাছে একটি ডালিম ধরিয়াছে। স্থানটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রায় কেহই সেই গাছের নিকটে আসিত না। বালিকা অতি কষ্টে জঙ্গল ঠেলিয়া গাছের নিকটে গেল, এবং দেখিল একটি ডালে সেই দাড়িম্বটি পক্ক অবস্থায় ঝুলিতেছে। সে যে কত আহ্লাদিত হইল, তাহা বলা যায় না। তাহার ইচ্ছা, অন্যের সাহায্য না লইয়া এই ডালিমটি নিয়া চারুকে দিবে। অনেক কষ্টে ডালিমটির নিকটে যাইয়া ও ডালটী নোয়াইয়া ধরিয়া বালিকা ডালিমটি পাড়িল, কিন্তু তাহার হাত ডালিমের কাঁটায় বাঁধিয়া বিলক্ষণ কাটিয়া গেল; ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। কমলা তাহাতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিল না। ডালিমটি লইয়া ঘরে আসিয়া পিসীমার অজ্ঞাতে একটু নেকড়া ভিজাইয়া হাতে বাঁধিল, এবং তাড়াতাড়ি চারুদের বাড়ী গেল। চারুর গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়নাথকে কহিল,—"দাদা, আমি একটি ডালিম

আনিয়াছি।" কথাটি চারুর কানে গেল। চারু অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন; তিনি মুখ ফিরাইয়া কমলার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"কমলা কেহ ডালিম পাইল না, তুমি কোথায় পাইলে?" কমলা বলিল,—"আমাদের গাছে এই একটি ডালিম ছিল।" সহসা কমলার হাতের দিকে চারুর দৃষ্টি পড়িল। হাতে কি হইয়াছে বলিয়া প্রশ্ন করায় বালিকা লজ্জায় কোন উত্তর দিল না। চারু তাহাকে কাছে আসিতে বলিলেন,—কমলা অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহার নিকটে গেল। চারু তাঁহার রোগক্লিষ্ট হস্ত দ্বারা কমলার হাতের বস্ত্রখণ্ড উন্মোচন করিলেন, এবং দেখিলেন, হাতটি অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে; কহিলেন,—"কমল, আমার জন্য ডালিম পাড়িতে যাইয়া হাতটি এমন করিয়া কাটিয়াছ?" কমলা লজ্জায় মুখটি আরও নত করিল, এবং নীরবে বুঝাইয়া দিল, এ কিছুই নহে। কেন বলিতে পারি না, প্রিয়নাথ এইদৃশ্য দেখিতে পারিলেন না, এবং মুহূর্ত্তের নিমিত্ত চারু ও কমলাকে একত্র রাখিয়া তিনি কোনও কার্য্যের ব্যপদেশে বাহিরে চলিয়া গেলেন। চারু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কমল, তুমি কি আমাকে দেখিতে আসিতে?" কমলা উত্তর করিল,—"আমি প্রত্যহই আসিতাম, কিন্তু অনেক লোক দেখিয়া আপনার নিকটে আসিতে পারিতাম না।" বালিকা তাহার মুখটি অবনত করিল।

৭

পূর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত ঘটনার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই বৎসরে চারুর জীবনে দুই অতি ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। চারু আরোগ্যলাভ করিবার পর ছয় মাস না যাইতে যাইতেই তাঁহার পিতার কাল হইয়াছে, এবং হরদেবের মৃত্যুর পর এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের তালুকটি পদ্মা নদীতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালায় পদ্মার ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল নদী আর নাই। ইহার গতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে মনুষ্যের ভাগ্যের গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পদ্মা আজ হয়ত কাহারও তালুক ভাঙ্গিয়া লইল, কাল হয় ত কাহারও ভাঙ্গা তালুক জাগাইয়া দিল। এক জনের অবস্থার অবনতি ও অন্যের উন্নতি হইল। চারু পিতৃহীন হইয়া মানসিক দুর্জ্জয় কষ্ট সহ্য করিলেও পদ্মার প্রকোপেই তাঁহাকে প্রায় ভিখারী হইতে হইল। এক তালুকের আয়েই ইঁহাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত; নদী তাহার সমস্তই গ্রাস করিল। দুই চারি মাস চারু তেমন কষ্ট পাইলেন না বটে, কিন্তু কিছু কাল পরেই সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া আসিল; চারু বিষম দারিদ্র্যে পড়িলেন। গ্রামে এমন লোক নাই, যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে। বিশেষতঃ কিছুকাল পূর্ব্বে চারুর পিতাই অনেককে সাহায্য করিয়াছেন, অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হইতে চারুর অভিমানে ভয়ানক আঘাত লাগিবার কথা।

বিপদ একা আইসে না, ইহা অনেকেই কহিয়াছেন। চারুর সংসারে একমাত্র তাঁহার জননী। ব্রাহ্মণী পতিশোকেই অতিশয় বিষণ্ণা হইয়াছিলেন। ভূসম্পত্তি ধ্বংস হইবার পর তিনি উন্মত্তার ন্যায় হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সাংঘাতিক রোগ দেখা দিল। মাতার শুশ্রূষার জন্য চারুকে বাড়ীতে না থাকিলে চলে না—এদিকে অন্নচিন্তাও বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জিনিষপত্র অলঙ্কার ইত্যাদি বিক্রয় করিলে হয় ত তাঁহার অনেক দিন চলিতে পারিত, কিন্তু তাহা করিতে চারুর কিছুতেই ইচ্ছা হইল না। যেরূপে পারি, স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া নিজের ও জননীর উদর পোষণ ও যতদূর সাধ্য পারিবারিক গৌরব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব, কেবল এইরূপ চিন্তাই তাঁহার মনে আসিতে লাগিল। কিছুদিন চেষ্টা করিয়া চারু নিকটবর্ত্তী এক

গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ বেতন দিয়া তাঁহার পিতা দুই তিন জন শিক্ষক রাখিয়া গিয়াছেন, এখন চারুকে সেইরূপ পদ গ্রহণ করিতে হইল।

প্রিয়নাথ, কমলা ও তাহাদের পিসী চারুর উপকার ভুলেন নাই। তাঁহারা তিন জনেই যত দূর সাধ্য চারুর সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। কমলা ও তাহার পিসী অনেক সময়েই চারুর বাড়ীর সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিয়া দিতেন। মাতা অশক্তা হইলেও চারুকে কথনও নিজে রন্ধন করিতে হয় নাই। কমলা এখন আর বালিকা নহে। বাঙ্গালীর কন্যা যে বয়সে যৌবনসীমায় পদার্পণ করে, তাহার সেইরূপ বয়ঃক্রম হইয়াছে। কমলা রন্ধন, পরিবেশন, গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি সাংসারিক কাজ কর্ম্ম সমস্তই শিখিয়াছে। সে প্রায় সর্ব্বদাই চারুর মায়ের কাছে থাকিত, এবং অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিত। ভৃত্য অনুপস্থিত থাকিলে চারু বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে কমলা তাঁহার পা ধুইবার জল, এবং গামছাখানি গুছাইয়া রাখিত।

কমলা এখন চারুর সমক্ষে প্রায়ই বাহির হইত না। পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীনভাবে সে তাঁহার সহিত কথাও কহিত না; তাহার হৃদয়ে লজ্জার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। চারুকে সে যেমন দেবতার ন্যায় দেখিত, এখনও তাহাই দেখে, কিন্তু তথাপি নিকটে যাইতে যেন সাহস করে না। চারু তাহার এই ভাব লক্ষ্য না করিতেন, এমন নহে।

একদিন বৈকালে কার্য্যস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া চারু দেখিলেন, তাঁহার জননী একাকিনী রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, তোমার কাছে কেহ নাই?" জননী উত্তর করিলেন,—"কমল ছিল, এই উঠিয়া যাইতেছে। বাবা, পরের মেয়ে, কিন্তু ও যে ভাবে আমার সেবা করি-

তেছে, আমার পেটের মেয়ে থাকিলেও ইহা অপেক্ষা অধিক করিত না। আমাকে ঠিক মায়ের মত ভক্তি করে। একটা কথা বলিব বলিয়া অনেক দিন মনে করিতেছি, আজ বলিয়া ফেলি। আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না, তোমাকে সংসারে একা ফেলিয়া যাইব। আমার ইচ্ছা, তুমি কমলকে বিবাহ কর, মেয়েটি বড়ই লক্ষ্মী, ও তোমার ঘরে আসিলে, তোমার অবস্থা ফিরিবে। তিনি থাকিতেই আমি একবার এ কথা পাড়িয়াছিলাম, কমলা পিতৃমাতৃহীনা বলিয়া তিনি তত মত দেন নাই। এখন তোমার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তুমি বড় ঘরে বিবাহ করিতে পারিবে, এমন আশা নাই। কমলার পিতার বংশ অতি উচ্চ, আমাদের করণীয় ঘর। আমার বড়ই ইচ্ছা, তুমি এই বিবাহ কর। তোমার মত কি? আমাকে বলিতে লজ্জা করিও না।" চারু কাঁদ কাঁদ মুখে উত্তর করিলেন,—"মা, আমি তোমার কুসন্তান, আমার অদৃষ্ট দোষেই, আমাদের অবস্থার এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তুমি এত কষ্ট পাইতেছ, এই অবস্থায় বিবাহের কথা আমার মনেই আসে না। যত দিন তুমি জীবিত থাক, আমি সাধ্যমত তোমার সেবা শুশ্রূষা করিব। জগদীশ্বর যদি দিন দেন, তখন বিবাহের কথা বিবেচনা করা যাইবে। কমলাকে আমি ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসি, আশীর্ব্বাদ করি, সে উপযুক্ত পতি লাভ করিয়া সুখী হউক, আমার দারিদ্র্যের সহিত আমি তাহার ভাগ্য মিশাইব কেন? কমলা পিতৃমাতৃহীনা হইলেও ভগবান তাহাকে ভাল বরই যুটাইয়া দিবেন।"

ভালবাসা সম্বন্ধে মানুষের হৃদয় বুঝিবার ক্ষমতা পুরুষ অপেক্ষা রমণীর অনেক অধিক। চারু অতি সাবধানে কথা কহিলেও তাহার জননী বুঝিয়া লইলেন, কমলার প্রতি চারুর ভালবাসা আছে। তবে পুত্রের হৃদয় এতই পবিত্র যে, কমলা যদি অন্য স্বামী পাইয়া অধিকতর সুখী হয়,

তাহা হইলে চারু তাহাতে বাধা দিতে প্রস্তুত নহেন। জননী সে দিন এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা কহিলেন না।

৮

কমলার বিবাহের বয়স হইয়াছে, ইহা আর পাঠককে না বলিলেও চলে। তাহার পিতা বর্ত্তমান থাকিলে এত দিন হয় ত বিবাহ হইয়াই যাইত। প্রিয়নাথ আশা করিয়া ছিলেন, চারু এবং চারুর পিতাই কমলার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিবার পক্ষে সাহায্য করিবেন। চারুর পিতা ত চলিয়াই গিয়াছেন, সম্পত্তিনাশের সঙ্গে সঙ্গে চারুরও সামাজিক প্রতিপত্তির অনেকটা লাঘব হইয়াছে। জমিদারী থাকিলে হয় ত চারুর বিবাহের সম্বন্ধের জন্যই মাসে মাসে তাহাদের বাড়ীতে ঘটক আসিত, কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। চারুর সহিত কমলার বিবাহের সম্বন্ধ উত্থাপিত হইতে পারে, এ কথা প্রিয়নাথের মনে কখনও উদিত হয় নাই। প্রিয়নাথ চারুকে অগ্রজের ন্যায় ভক্তি করিত, কিন্তু পিসীমা ও কমলা ইঁহাদের উভয়ের মনেই এ কথা আসিত। চারুর মা ও কমলার পিসীমা দুই জনেই বুঝিয়াছিলেন, এ বিবাহে দম্পতি সুখী হইবে। পূর্ব্বেই দুইবার বলা হইয়াছে, কমলা চারুকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। আমাদের অসহায় অবস্থায় উনিই আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। বাগানের আমগুলি পাড়িয়া ভাল ভাল আমগুলি আমাকে ও দাদাকে দিয়া গিয়াছেন। উঁহার যে কোন জিনিসে যেন উঁহার ও আমাদের সমান অধিকার, সর্ব্বদাই এই ভাব দেখাইয়াছেন, আমরা দরিদ্র বলিয়া এক দিনও আমাদিগকে ঘৃণা করেন নাই, এইরূপ স্মৃতি ও ভাব বালিকার হৃদয়ে স্তরে স্তরে সজ্জিত ছিল। দেবতার স্বভাব না হইলে গরীবকে এত ভালবাসিতে পারে না, সে ইহাই মনে করিত। বিবাহের কথা, ভালবাসার কথা যখন সে বুঝিত না, তখন সে চারুকে প্রাণ ভরিয়া

ভক্তি করিত। এখন যখন সে বিবাহের কথা বুঝিতে লাগিল, দুই এক স্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, তখন সে দেখিল, তাহার সেই শৈশব-সঞ্চিত ভক্তি ভালবাসায় মিশিয়া যাইতে চাহে। উনি দেবতা, আমি মানুষ। আমি উঁহার পরিণীতা ভার্য্যা হইবার উপযুক্ত নহি। তবে চিরদিন দাসীর ন্যায় আমি উঁহার সেবা করিতে পারি। কমলা মনে মনে এইরূপই ভাবিত। তাহার মনের এই ভাব তাহার পিসীমা ও চারুর মা উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু চারু কিংবা প্রিয়নাথ তেমন বুঝিতে পারেন নাই।

চারু বিবাহ না করিয়া আরও দু চারি বৎসর কাটাইতে পারেন, বিবাহ একেবারে না করিলেই বা কি? কিন্তু কমলা কন্যা, তাহার বিবাহ হওয়াই চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কমলাব পিতার বংশ অতি উচ্চ, আর কমলা অতিশয় সুরূপা ছিল। সুতরাং তাহার ভাল বর না যুটিবার বিশেষ আশঙ্কা ছিল না।

একদিন কমলার বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া এক ঘটক আসিয়াছে। তাহার সহিত কমলাকে দেখিবার নিমিত্ত দুই এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে জল খাইতে দিতে হইবে বলিয়া কমলার পিসী দু'খানি বাসন মাজিবার জন্য কমলার হাতে দিয়া তাহাকে পুকুরের ঘাটে পাঠাইয়াছেন। অবস্থান্তরে হয় ত কমলাকে এই সময়ে অন্য স্ত্রীলোকে সাবান মাখাইত। কমলা নিজে বাসন মাজিতেছে। বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। বালিকা একাকিনী পুকুরের দিকে চাহিয়া এক একখানি বাসন ডলিতেছে, আর অবিশ্রান্ত অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে। তাহার এক একবার মনে হইতেছে, আমি কেন পিসীমার বাসনগুলি উপরে রাখিয়া দিয়া জলে ডুবিয়া মরি না?

কমলা কেন কাঁদে, আর এমন কথাই বা কেন ভাবে?

সহসা পশ্চাতে মনুষ্য পদধ্বনি শ্রুত হইল। বালিকা চাহিয়া দেখে, চারু। তিনি একটি গাড়ু হাতে করিয়া ঘাটে আসিতেছেন। কমলা দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। তিনি যেন একজন অপরিচিত আগন্তুক, বালিকা এই ভাবে নিজের মস্তকে বস্ত্র টানিয়া লইল, এবং চারুচন্দ্রের বিপরীতমুখী হইয়া বাসন-মার্জ্জন কার্যে ব্যাপৃতা হইল।

চারুচন্দ্র কমলার চক্ষে জল দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাহার সলজ্জ ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কমল তুমি কি কাঁদিতেছ?'

কমলার উত্তর নাই।

চারুচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কমল কাঁদছ কেন?'

কমলা এবারেও কোন উত্তর দিল না।

চারুচন্দ্র আর পীড়াপীড়ি না করিয়া গাড়ুতে জল পূরিয়া উপরে উঠিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহার অর্থ কি? কমলা আমার সঙ্গে কথা কহিল না কেন?

প্রশ্নের উত্তর বাহির করিতে অধিক সময় লাগিল না। কমলার বিবাহের ঘটক আসিয়াছে, তিনি শুনিয়াছিলেন; সিদ্ধান্ত করিলেন, বালিকা এ বিবাহে সম্মত নহে, সে আমারই প্রতি অনুরাগিণী। সে দিন মার সহিত আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল, হয়ত ও তাহাও শুনিয়াছে। মনে মনে বোধ হয় আমাকেই ভৎর্সনা করিতেছিল, বলিতেছিল, 'তুমি যত দিন ইচ্ছা বিবাহ না করিয়া থাকিতে পার। আমাকে যে জীবনের জন্য ডুবিয়া যাইতে হয়।' চারুর সেই ডালিম পাড়ার কথা মনে পড়িল। তাহার প্রতি কমলার অকৃত্রিম ভক্তিসূচক কত শত ক্ষুদ্র কথাই মনে আসিল। চারুর মত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ভাবিলেন, কমলা যদি আমার হৃদয় চায়, তাহা পাইবে। আমি ত আর কোন

বালিকাকে ভাল বাসি নাই। দুঃখ আসিয়া দুঃখে মিশুক। দরিদ্রতা দরিদ্রতার সঙ্গিনী হউক।

মাকে মনের ভাব জানাইতে চারুচন্দ্রের কালবিলম্ব হইল না। চারুর মা কমলার বিবাহের জন্য ঘটক আসিবার কথা শুনিয়াছিলেন। চারু মুখ হাত ধুইয়া তাঁহার কাছে আসিলে, তিনিই কথা পাড়িলেন,—"বাবা, বাঁচবোও না আর বেশীদিন, তোমার বিবাহটা দেখে যাবার বড়ই ইচ্ছা ছিল। আর কিছু থাক্ না থাক্, নিজের গয়না ক'খানা তাকে দিয়ে যেতেম। বৌয়ের মুখখানা দেখে গেলে, মনটা আমার বড়ই সুখী হ'ত। কমলাকে বিয়ে কল্লে ক্ষতি কি? মেয়েটি ত নয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। নামেও কমলা, কাজেও কমলা।"

চারু আজ ম'ার কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে জননীর অধিকক্ষণ লাগিল না।

সেই দিন রাত্রিতেই চারুর মা কমলার পিসীকে ডাকিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষণকাল পরে প্রিয়নাথকেও ডাকা হইল।

বলা বাহুল্য, এ প্রস্তাবে সকলেই সন্তুষ্ট। সেই দিনই স্থির হইয়া গেল যে, এক মাসের মধ্যেই শুভদিন দেখিয়া বিবাহ হইবে।

চারুর মা'র ইচ্ছা থাকিলেও চারুচন্দ্র বিবাহে কিছুমাত্র ব্যয়বাহুল্য করিতে দিলেন না। যাহাকে শাঁক বাজাইয়া বিবাহ হওয়া বলে, হরদেব ভট্টাচার্য্যের পুত্রের সহিত বামনদাস বিদ্যারত্নের কন্যার বিবাহ প্রায় সেই ভাবে হইল। কিন্তু যাহাদের বিবাহে হস্তী, অশ্ব, যান প্রভৃতির প্রভূত আড়ম্বর হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যেও, বোধ হয়, অনেক দম্পতীর পরস্পরের প্রতি চারু কমলার ন্যায় নির্ম্মল অনুরাগ ও পবিত্র প্রণয় থাকে না।

উপসংহার।

চারুর সহিত কমলার বিবাহের পর ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চারুর গৃহে কমলার আগমনে কমলারও আগমন হইয়াছে। যে বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে তাহাদের বিবাহ হয়, সেই বৎসর মাঘ মাসেই চারুদের পদ্মাগর্ভে নিমগ্ন নষ্ট তালুকের জলমগ্ন স্থানে এক ক্ষুদ্র চর ভাসিয়া উঠে। দুই বৎসরের মধ্যেই এই চর প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়া পুনরায় মনুষ্যের আবাসের উপযোগী হয়। পদ্মা যেন চারুর তালুক আবার ফিরাইয়া আনিয়া দিলেন। ঢাকা জেলার কালেক্টর সাহেব তদন্ত করিয়া এই চর চারুকে ছাড়িয়া দিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। চারুর চরের এখন বার্ষিক আয় ছয় হাজার টাকা। চারু বড় মানুষ। চারু-কমলার দাম্পত্যজীবন অতিশয় সুখের হইয়াছে, ইহা বলিবার প্রয়োজন আছে কি?

কমলা ভাবিত, আমি দেবতার সহিত মিলিত হইয়াছি। চারু ভাবিতেন, বিবাহের সময়ে আমার যে অবস্থা ছিল, আন্তরিক প্রীতি না থাকিলে এ কখনই আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে এত আগ্রহ করিত না। অন্তঃকরণ উভয়েরই নির্ম্মল ছিল। এমন দম্পতী সুখী হইবে না কেন?

স্বামীর কাছে কমলার এক আব্‌দার হইল যে, বাড়ীতে একটি টোল করিয়া তাহাতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হউক। চারু অতিশয় সন্তোষের সহিত এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন। চারুর বাটীতে এখনও অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণসন্তান শিক্ষা পাইতেছেন। কমলার দ্বিতীয় অনুরোধ, কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্থের অভাবে বিপদে পড়িয়া দ্বারস্থ হইলেই তাঁহাকে যেন যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ সাহায্য করা হয়।

চারুচন্দ্র এ অনুরোধও উপেক্ষা করেন নাই। ভৈরব কয়ালের অত্যাচারের কথা কমলার এখনও মনে আছে।

ভৈরবের কথা শুনিবার নিমিত্ত পাঠকের আকাঙ্ক্ষা আছে কি? ভৈরবের একমাত্র পুত্র উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। একদিন এক দরিদ্র অধমর্ণের প্রতি দয়া ভিক্ষার্থ পুত্র পিতাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল। পাষাণ-হৃদয় ভৈরব সে অনুরোধ রক্ষা করে নাই। পুত্র শেষে কহিল,—বাবা আপনি এরূপভাবে অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন কার জন্য?

ভৈরব উত্তর করিলেন,—"তোরই জন্য।"

"আমার জন্য হইলে, আর করিতে হইবে না"—বলিয়া পুত্র পিতার নিকট হইতে চলিয়াগেল। সেই দিন রাত্রিতেই সে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

ইহাতেও ভৈরবের অর্থের প্রতি মমতা কমে নাই। তবে এমন অনেক সময়েই তাহার চক্ষে জল দেখিতে পাওয়া যায়।

চারু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই স্ত্রীকে বলেন,—'এ তালুক তোমারই ভাগ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে।' ইহার আয়, তুমি যে ভাবে বল, আমি সেই ভাবেই ব্যয় করিতে বাধ্য।'

কমলা উত্তর করেন,—'আদরের উত্তাপ অত বাড়িলে আমি গলিয়া যাইব।'

স্বামীর সোহাগে কমলার মুখ ফুটিয়াছে, না?

প্রভু ও ভৃত্য।

১

মকিমপুরের মফজ্জল হক্ মিঞা এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদার। তাঁহার ভূসম্পত্তির আয় বার্ষিক দশ সহস্র মুদ্রার ন্যূন নহে। মকিমপুর নদীয়া জেলায়; কিন্তু মিঞা সাহেবের অধিকাংশ জমিদারী মেদিনীপুরে। জমিদারী দেখিতে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মেদিনীপুর যাইতে হয়। মেদিনীপুর সহর হইতে ক্রোশাধিক দূরেই মফজ্জল হকের সম্পত্তি। মফজ্জল হক্ শিক্ষিত ও উদার-চরিত্র। দেশে তাঁহার যথেষ্ট সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি। তিনি একজন অনরারি মাজিষ্ট্রেট; তাঁহার বয়ঃক্রম ৪২।৪৩ বৎসর হইয়াছে।

মিঞা সাহেবের এক ভৃত্যের নাম নবিবক্স। সে ২২।২৩ বৎসরের যুবক। শৈশব হইতেই সে মিঞাসাহেবের বাড়ীতে প্রতিপালিত। সে তাঁহাদেরই বাড়ীর এক বাঁদীর গর্ভজাত সন্তান। তিন বৎসর বয়সের সময়ে তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। মিঞা সাহেব মাতৃহীন শিশুকে

আপন পুত্রের ন্যায় পালন করিয়া তাহাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন। নবিবক্সও তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রভুর ন্যায় সম্ভ্রম করিত। মিঞা সাহেব তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন, এবং অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। ষোল সতের বৎসর বয়স হইতেই মফজ্জল হক তাহাকে আপনার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। বাহিরের লোকে তাহাকে চাকর বলিয়া চিনিতে পারিত না। একমাত্র প্রভুর সমক্ষেই সে ভৃত্যের ন্যায় থাকিত। বাটীর বাহির হইলেই তাহার পায়ে তিন চারি টাকার জুতা ও গায়ে ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোগী জামা প্রভৃতি দেখা যাইত। মলিন বস্ত্রে অথবা হীনবেশে বাহির হইলে মিঞা সাহেবই তাহাকে তিরস্কার করিতেন। অনেক সময়েই তিনি নিজের ব্যবহৃত অর্দ্ধপুরাতন বস্ত্রাদি তাহাকে দান করিতেন।

বাড়ী হইতে ক্রোশাধিক দূরে যাইয়া মিঞা সাহেবকে বেঞ্চে বসিয়া অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতে হইত। তিনি সাধারণতঃ পাল্‌কিতে চড়িয়া কাছারী যাইতেন। নবিবক্স ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত। যতক্ষণ তিনি কাজ করিতেন, সে বাহিরে ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া কাছারীতে তাঁহার আর্দালির ন্যায় কাজ করিত। কাজ শেষ হইয়া গেলে, মনিব যেমন বাড়ী ফিরিতেন, সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। মিঞা সাহেবের সহিত মেদিনীপুরে গেলে নবিবক্সই একরূপ প্রভুর কর্ত্তা হইয়া উঠিত। মফজ্জল হকের মূল্যবান্ বস্ত্রাদি ও হীরকাঙ্গুরীয় প্রভৃতি সমস্তই তাহার জিম্বায় থাকিত। মিঞাকে সে যাহা খাইতে দিত, তিনি তাহাই খাইতেন। অধীন লোকের উপরও তাহার প্রভুত্বও যথেষ্ট ছিল। কোনও প্রজা, অধমর্ণ বা কর্ম্মচারী বিপদে পড়িলে, প্রায়ই তাহার শরণ লইত। সে মিঞাকে একটা

অনুরোধ করিলে তাহা প্রায়ই উপেক্ষিত হইত না। সে তাহার জীবনে এ পর্য্যন্ত কখনও প্রভুর এই বিশ্বাস ও অনুগ্রহের অপব্যবহার করে নাই।

নবিবক্স বার তের বৎসরের সময় হইতেই মিঞা সাহেবের সহিত মেদিনীপুর যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি মেদিনীপুরে মফজ্জল হকের জমিদারীর মধ্যেই তাহার বিবাহ হইয়াছে। বাঁদির সন্তান বলিয়া দেশে কিছু গোল হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মিঞা সাহেব স্বয়ং তাহার এই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। মিঞা সাহেবের বাসা মেদিনীপুর সহরের মধ্যে। নবিবক্সের শ্বশুর বাড়ী সেখান হইতে ক্রোশাধিক দূরে। মিঞার সহিত মেদিনীপুরে আসিবার আগ্রহ তাহার বাল্যকাল হইতেই ছিল। বিবাহের পরে সে আগ্রহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। নবিবক্স যুবক, তাহার ভার্য্যা তরুণী ও রূপবতী। বংশ অতি হীন হইলেও মিঞা সাহেব কন্যাটি সুন্দরী দেখিয়াই এই সম্বন্ধ স্থির করেন। বিবাহের সময়ে বালিকার যে সৌন্দর্য্য ছিল, যৌবনে তাহা আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। নবিবক্স সারাদিন বাসায় কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় শ্বশুর বাড়ীতে যাইত, এবং প্রত্যূষে আসিয়া প্রভুর কার্য্যে উপস্থিত হইত। ইহাতে বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে শ্বশুরবাড়ীতে যাইবার জন্য বরং তিনিই উৎসাহিত করিতেন। যুবক ক্ষণকাল লজ্জার ভান করিয়া শেষে প্রভুর আজ্ঞাই প্রতিপালন করিত। রাত্রি অন্ধকার হইলে, তিনি তাহাকে আলোক লইয়া যাইতে কহিতেন; আকাশে মেঘ থাকিলে, তাহাকে ছাতা লইয়া যাইতে উপদেশ দিতেন। পিতা যেমন পুত্রকে আদর করিয়া শ্বশুরবাড়ীতে পাঠান, মিঞা সাহেব তাহাকে ঠিক সেই ভাবে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। ফলতঃ তিনি যেন সর্ব্বাংশেই তাহার পিতৃস্থানীয় ছিলেন। তাহার শ্বশুর তাঁহার এক সামান্য প্রজা এবং জাত্যংশে অতি ক্ষুদ্র মুসলমান। নবি-

বক্সের খাতিরে মিঞা সাহেব অনেক সময়ে তাহাকে বৈবাহিক সম্বোধন করিতেন। সময়ে সময়ে তাহার সহিত হাস্য কৌতুক বা তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেন না। চাষার প্রাণ এই আদরে গলিয়া যাইত। ক্রমশঃ সাহস বাড়িয়া যাওয়ায় সে মিঞা সাহেবকে তাহার গরুর দুধ বা গাছের আম, ভূস্বামীর উপঢৌকন ভাবে না পাঠাইয়া, বৈবাহিকের তত্ত্বের ন্যায় পাঠাইয়া দিত, এবং সময়ে সময়ে বাড়ীতে প্রস্তুত পিষ্টকাদিও তাঁহাকে উপহার প্রদান করিতে কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইত না। উদারস্বভাব মফজ্জল হক্ সাদরে এই সমস্ত গ্রহণ করিতেন। শ্বশুর অথবা শ্যালক কোন দ্রব্য সামগ্রী লইয়া মনিবকে দিতে আসিয়াছে জানিতে পারিলেই, নবিবক্স বাসা হইতে নিরুদ্দেশ হইত, এবং যতক্ষণ না তাহারা ফিরিয়া চলিয়া যাইত, ততক্ষণ মফজ্জল হক বা তাঁহার অন্য ভৃত্যগণ কোন মতেই নবিবক্সের সন্ধান পাইতেন না।

৩

সহসা নবিবক্সের শ্বশুরের সহিত ভূস্বামীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। নবিবক্সের শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের এক মুসলমানই মফজ্জল হকের তহশীলদার ছিল। সে সৎপ্রকৃতির লোক ছিল না। প্রজার নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করিয়া সে নিজে আত্মসাৎ করিয়াছিল। মিঞা সাহেব ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেন, এবং গ্রামান্তরের অন্য একটি লোককে তহশীলদার নিযুক্ত করেন। এই সময়ে অনেকগুলি প্রজার নামে তাঁহাকে বাকি খাজনার নালিশ করিতে হয়। কর্ম্মচ্যুত তহশীলদারের গ্রামে বেশ প্রভুত্ব ছিল। সে প্রজাগণকে বুঝাইয়া দিল যে, মনিবই টাকা পাইয়া এখন তাহা অস্বীকার করিতেছেন। গ্রামের অন্যান্য সমস্তপ্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে দল বাঁধিল। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, নবিবক্সের শ্বশুরকেও তাহাদের দলে মিশিতে হইল।

গ্রামের সমস্ত প্রজা জমিদারের খাজনা বন্ধ করিল, এবং নূতন তহশীলদার গ্রামে আসিলেই তাহার প্রতি অত্যাচার করিবে, এইরূপ সঙ্কল্প করিল। ক্রমে প্রজাগণ রীতিমত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নবিবক্সের উভয় সঙ্কট। এক দিকে তরুণী পত্নীর কথা মনে হইলেই তাহার শ্বশুর বাড়ী যাইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে; কিন্তু অন্য দিকে সে তৎক্ষণাৎ ভাবে যে, তাহার শ্বশুর এখন তাহার পিতার ন্যায় প্রতিপালক প্রভুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। প্রজাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইবার পবে দু'চারি দিনের মধ্যে নবিবক্স তাহার শ্বশুর বাড়ীর নামও মুখে আনিত না।

এক দিন সন্ধ্যার সময়ে মিঞা সাহেব নিজে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুই আর শ্বশুরবাড়ী যাস না কেন?'

নবিবক্স কহিল—'আমি ও বিবাহের কথা ভুলিয়া যাইব।'

মিঞা কহিলেন,—'তোর শ্বশুরই যেন গ্রামের লোকের সহিত আমার বিরুদ্ধে যোট্ বাঁধিয়াছে, তাহার কন্যা কি অপরাধ করিল? তুই শ্বশুর বাড়ী যা। যতদিন তারা না তোর উপর কোনও অত্যাচার করে, ততদিন তুই পূর্ব্বের ন্যায় যাতায়াত করিবি।'

নবিবক্স দ্বিরুক্তি না করিয়া অবনত মুখে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

৪

দু'চারি দিনের মধ্যেই তাহার শ্বশুর শ্যালক এবং অন্যান্য সম্পর্কিত লোক তাহাকে হাত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে, এই প্রস্তাব শুনিয়া সে প্রথম দিন আহতফণ সর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং কহিল,—'কাল হইতে আর তোমরা আমার মুখ দেখিতে পাইবে না।'

তাহার শ্যালকেরা একটু নরম হইয়া বলিল,—"আমরা তোমার মন বুঝিবার জন্য ঐরূপ কহিয়াছিলাম; তুমি যেমন আসিতেছ আসিও, আমরা তোমার সাহায্যপ্রার্থী নহি।

নবিবক্স তাহাদের কথা সরলভাবে বিশ্বাস করিল, এবং তৎপরদিনও পুনরায় শ্বশুর বাড়ী আসিল। সেই দিন রাত্রিতে তাহাকে বড় কঠিন ঔষধ প্রদত্ত হইল। এবার শ্বশুর কিংবা শ্যালক নহে, তাহার তরুণী ভার্য্যা স্বয়ং ঔষধ প্রয়োগ করিল। যুবকের কর্ণে যুবতী স্ত্রীর অনুরোধ কিরূপ ফলপ্রদ, তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। নবিবক্সের স্ত্রী এমন সাজাইয়া গুছাইয়া আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিল, এমন ভাবে যুবক পুরুষকে মোহের ফাঁদে ফেলিল যে, নবিবক্স প্রথমতঃ তাহার প্রস্তাব ক্রোধের সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেও, অল্পক্ষণেই নিজের সুর নরম করিয়া আনিল এবং স্ত্রীকে বুঝাইতে লাগিল যে এমন নিমকহারামী কাজ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রী এইবার কান্নার ধুয়া ধরিল, এবং কহিল,—"আমাকে কিছুমাত্র ভালবাসিলেও তুমি এমন কথা বলিতে পারিতে না। তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না; কেবল তুমি সন্ধানটি বলিয়া দিবে, আর গ্রামের লোকদিগকে সামান্য সাহায্য করিবে, ইহাতে ভয় পাইতেছ কেন?"

নবিবক্স পুনরায় তর্ক আরম্ভ করিল। কিন্তু স্ত্রীর সহিত বাগ্‌যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজ নহে। অনেক সময়েই "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী" জানিয়াও অনেক শিক্ষিত এবং গঠিতচরিত্র লোক সেই বুদ্ধির কাছে হার মানিয়া থাকেন, অশিক্ষিত নবিবক্স কোন্ ছার? রাত্রি শেষে সে স্ত্রীর প্রস্তাবে প্রায় নিমরাজী হইয়া শয্যাত্যাগ করিল।

৫

পরদিন সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আজ আর শ্বশুরবাড়ীতে যাইব না। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে মিঞা সাহেবই যেন তাহার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। সন্ধ্যা সমাগমেই তাহার নিজের মন দোলায়মান

হইয়া আসিতেছিল। মফজ্জল চক্ যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই শ্বশুরবাড়ী গেলি না?"

অমনই সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল, এবং শ্বশুর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, আমি ইচ্ছা করিয়া যোগ না দিলে কাহার সাধ্য আমাকে অন্যায় কার্য্য করায়! সে জানিত না যে, আজ তাহার জন্য অন্যান্য দিন অপেক্ষা অতি বিষম ফাঁদ পাতা হইয়াছে। আহারান্তে শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া নবিবক্স দেখিল, আজ তাহার স্ত্রী অভিনব সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া মনোহারিণী মূর্ত্তিতে তাহারই অপেক্ষা করিতেছে। নবিবক্স দরিদ্র হইলেও প্রভুর অনুগ্রহে মূল্যবান আতর গোলাপ প্রভৃতির ব্যবহার জানিত, এবং সময়ে সময়ে সে স্ত্রীকে এই সমস্ত দ্রব্য উপহার দিত। স্ত্রী আজ সেই সমস্ত ব্যবহার করিয়া পরীর ন্যায় শয়ন গৃহে দাঁড়াইয়া ছিল। নবিবক্স তাহার দিকে অগ্রসর হইলেই সে কহিল,—"আমার কাছে আসিও না; যদি আমার কথা রাখ, তবেই এস, না হয় চলিয়া যাও। আমি তোমার কে?"

নবিবক্স ক্ষণকাল-ইতস্ততঃ করিল। তরুণী তাহার দিকে এক বিষময় কটাক্ষ হানিয়া কহিল,—"তবে আমি চলিলাম।"

নবিবক্স সে কটাক্ষবাণ সহ্য করিতে পারিল না। কহিল—"বল, আমাকে কি করিতে হইবে।"

রমণী শিক্ষামত উত্তর করিল,—"গ্রামের কয়েক জন লোক তোমার সঙ্গে যাইবে। তুমি সন্ধান বলিয়া দিবে, উহারা তোমার মনিবের গৃহ হইতে তাঁহার নামাঙ্কিত মোহর দেওয়া কতকগুলি ছাপান দাখিলার শাদা ফারম্ চুরি করিয়া আনিবে। ঐ ফারম্ কোন ঘরে কোথায় আছে, তাহা তুমি নিশ্চয় জান।"

নবিবক্স শিহরিয়া উঠিল, কহিল—"আমি ইহা কিছুতেই পারিব না।"

যুবতী বলিল,—"তা ত পারবেই না জানি। আমাকে কিছুমাত্র ভাল বাসলেও পারতে।"

এমন মিহিস্বরে শেষের এই কথা কটি উচ্চারিত হইল যে, তাহাতেই নবিবক্সের মন ফিরিল। পতঙ্গ বহ্নি মুখে ঝাঁপ দিল। নবিবক্স জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিল।

ধন্য মশারির বক্তৃতা! নবিবক্সের শ্বশুরালয়ে মশারি ছিল কি না, আমরা অবগত নহি। কিন্তু তাহার প্রতি যে মশারির বক্তৃতার শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, 'মশারির বক্তৃতা' কথাটি তাঁহাদের কানে লাগিতে পারে; কিন্তু অর্থ বুঝিতে কষ্ট হইবে না ইহা নিশ্চিত।

নবিবক্স মফজ্জল হক মিঞার বাসার সমস্ত সন্ধানই জানিত। একটা বড় কাঠের বাক্সের মধ্যে মিঞাসাহেবের একটি ছোট হাত বাক্স থাকিত। ইহারই মধ্যে টাকা কড়ি, প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ ও ছাপানো দাখিলার ফারম্ ছিল। বড় বাক্সের চাবি যেখানে থাকিত, সে তাহাও জানিত। গ্রামের দু'তিন জন লোকের সঙ্গে নবিবক্স সেই অন্ধকার রাত্রিতে আপনার অন্নদাতা প্রভুর অনিষ্টসাধন করিতে যাত্রা করিল। আকাশে মেঘ ছিল, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলসাইতেছিল। বিদ্যুৎ স্বর্গের আলোক। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাপ সঙ্কল্পময় হৃদয় চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। আলোক দেখিলেই সে ভীত হইয়া মনে করিতে লাগিল, এমন কাজ কখনই করিব না। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত সহচরেরা তাহাকে যেন অন্ধের ন্যায় চালাইয়া লইয়া গেল, আর স্ত্রীর মূর্ত্তি মনে হইবামাত্রই তাহার সাধুসঙ্কল্প ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। এ দিকে আকাশে মেঘ জমাট বাঁধিয়া আসিল। বিদ্যুৎ থামিয়া গেল। নবিবক্স ও তাহার সঙ্গিগণ আপনাদের সংকল্পিত কার্য্যে অগ্রসর হইল।

খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি এই যে, মানবের আদিপুরুষ আদম তাঁহার স্ত্রী হবা কর্ত্তৃকই প্রথমতঃ পাপপথে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই অনুরোধে মহাপ্রভু সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ লঙ্ঘন করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। নবিবক্স সামান্য মানব, স্ত্রীর কথায় প্রভুর অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইবে, ইহা বিচিত্র কি?

রাত্রি দুই প্রহরের পর মফজ্জল হক্ মিঞার বাসায় চোর চোর বলিয়া একটা রব উঠিল। মিঞা সাহেবের বাসার অতি নিকটে মেদিনীপুর পুলিসের কোর্ট সব ইনস্পেক্টরের বাসা। সেই বাসাতে এক জন কনষ্টেবল শুইয়া থাকিত। চোর চোর চীৎকার শুনিয়াই সে জাগিয়া উঠিল, এবং তাহাদের বাসার উত্তর দিকে জঙ্গলের নিকট একটা শব্দ শুনিতে পাইল। কনষ্টেবল সেই দিকে দৌড়াইল, এবং দেখিতে পাইল, তিনটি লোক একটি ছোট হাতবাক্স ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র দু'টি লোক দৌড়াইয়া পলাইল। তৃতীয় ব্যক্তি ধরা পড়িল। ইহারা কেহই ব্যবসায়ী চোর নহে। বাক্সটি লইয়া দৌড়িয়া পলাইলে, হয়ত তাহারা কেহই ধরা পড়িত না। কিন্তু সে বুদ্ধি তাহাদের আসে নাই। তাহারা মনে করিয়াছিল, এই জঙ্গলে বসিয়া বাক্সটি ভাঙ্গিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া যাইবে। অপর দু'টি লোক দৌড়াইয়া গিয়াছিল। নবিবক্স সর্ব্বাপেক্ষা কাঁচা বলিয়া পুলিসের হাতে ধরা পড়িল।

মোকদ্দমা হইতে অধিক সময় লাগিল না। পর দিন প্রভাতেই নবিবক্স হাজতে প্রেরিত হইল, এবং তৎপরদিন সে বিচারালয়ে নীত হইল। পুলিস বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার নিকট হইতে তাহার সঙ্গী অন্য দুইটি আসামীর নাম বাহির করিতে পারিলেন না। সে কেবলই বলিতে লাগিল, সমস্ত অপরাধই আমার। আমি সন্ধান না দিলে

তাহাদের সাধ্য কি যে, আমার মনিবের অনিষ্ট করে? পুলিস অগত্যা তাহাকেই চালান দিলেন।

বিচারক এক জন বাঙ্গালী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। তিনি মফজ্জল হক্ মিঞাকে জানিতেন। মিঞা সাহেবের এক জন ভৃত্য পুলিসে এজাহার দিয়াছিল। প্রথমতঃ তাহার জবানবন্দী গৃহীত হইল। নবিবক্স মাথা হেঁট করিয়া কাট গড়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ—চেহারা ঠিক উন্মত্তের ন্যায়। সাক্ষীর পরীক্ষা শেষ হইলে, হাকিম আসামীকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করিবে?"

নবিবক্স অতি কষ্টে উত্তর করিল, "হুজুর, না।"

দ্বিতীয় সাক্ষী মিঞাসাহেব স্বয়ং। তাঁহার নাম ডাক হইবামাত্রই আসামী অজ্ঞান অবস্থায় কাঠগড়ায় বসিয়া পড়িল। কোর্টের কনষ্টেবল তাহাকে উঠাইয়া তাহার মস্তকে ও চক্ষে জল দিল। সে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে মিঞাসাহেব আদালত-গৃহে প্রবেশ করিলেন। নবিবক্সের প্রতি একবার দৃষ্টি করিয়াই তিনি বিচারকের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"হুজুর! আমি এ মোকদ্দমা চালাইতে চাহি না। ধর্ম্মাবতার, দয়া করিয়া আসামীকে নিষ্কৃতি দিন।"

বিচারক কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই আসামী ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিল—"হুজুর, আমাকে ফাঁসী দিন্। ফাঁসী হইলেও আমার এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

হাকিম বলিলেন,—"এ মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে, ইহা ছাড়িয়া দিবার মোকদ্দমাও নহে, ফাঁসীর মোকদ্দমাও নহে।" অনন্তর মিঞাসাহেবকে কহিলেন,—"আপনি হলফ করুন।"

"নবিবক্স বলিয়া উঠিল,—"হুজুর! উঁহাকে হলফ করিতে হইবে না। আমি যাহা যাহা করিয়াছি, সমস্ত বলিয়া যাইতেছি। আর ফরিয়াদী

ও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়াছে। ধর্ম্মাবতার! দয়া করিয়া আমাকে একবার মিঞাসাহেবের কাছে যাইতে অনুমতি দিন ”

হাকিম অনুমতি দিলেন। এক জন কনষ্টেবল আসামীকে কাঠগড়া হইতে আনিয়া মিঞার নিকটে দাঁড় করাইল। নবিবক্স ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রভুর পাদুকা চুম্বন করিল, এবং পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিল, —“আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন না।”

মিঞাসাহেব কহিতে লাগিলেন,—“আমি তোকে ক্ষমা করিয়াছি।” অনন্তর হাকিমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“হুজুর ওকে ছাড়িয়া দিন ও কেবল মানুষের পরামর্শে পড়িয়া এমন কর্ম্ম করিয়াছে।”

আসামী জেদ করিতে লাগিল,—“হুজুর আমাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইয়া দিন। আমি এমন মনিবের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। আমার এই গায়ের কাপড়, পায়ের জুতা, যাহা কিছু সকলই এই মনিবের। অনেক বাপেও পুত্রকে এত ভালবাসে না। এক দিন একটা ধমক খাই নাই,—

মিঞাসাহেবের চক্ষুতে জল আসিল। তিনি হাকিমের নিকট শেষ প্রার্থনা করিয়া অতিশয় বিনয় অথচ আবেগের সহিত কহিলেন,—“ধর্ম্মাবতার! দয়া করিয়া ইহাকে যে দণ্ড ইচ্ছা দিন, আমি ইহার দণ্ডের জন্য প্রার্থী নহি।”

আসামী ফরিয়াদীর ভাব দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই বিচলিত হইলেন। এক দিকে অকৃত্রিম অনুতাপ ও মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা. অন্য দিকে উদার ক্ষমা ও অসীম সহানুভূতি। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। হাকিম স্বয়ং রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। তিনিও ত মানুষ। সকলেই মিঞাসাহেবকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, আর কহিতে লাগিল,—“যেমন বংশে জন্ম, তেমনই দয়া ও মহত্ত্ব।”

একজন বৃদ্ধ ব্যবহারাজীব হাকিমকে কহিলেন,—"হুজুর এ মোকদ্দমায় কেবল আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসামীর প্রতি সামান্য দণ্ডবিধান হয়, ইহা আমাদের সকলেরই প্রার্থনা।"

বিচারক এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন না। তিনি আসামীর প্রতি সামান্য কারাবাস ও কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া মোকদ্দমা শেষ করিলেন। অর্থদণ্ড মিঞাসাহেব কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত হইল। নবিবক্স সেই দিনই মুক্তিলাভ করিল। তাহার মানসিক লজ্জা ও অনুতাপ, কারাদণ্ড অপেক্ষা অধিকতর কঠোর বোধ হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে তাহাকে মিঞাসাহেবের বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। "আমি হারাম, এমন পীরের কাছে আর যাইব না" বলিয়া সে পুনঃপুনঃ কাতরভাবে রোদন করিয়াছিল।

উপসংহার।

নবিবক্সের শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের দুই চারি জন প্রজা কাছারীতে এই মোকদ্দমা দেখিতে আসিয়াছিল। সঙ্গী দু'জন চোরও কাছারীর নিকটেই ছিল। নবিবক্স ও তাহার মনিবের ব্যবহার দেখিয়া তাহারা সকলেই বিস্মিত হইল। সেই দিনই তাহারা গ্রামে যাইয়া সকলে একত্র হইল, কিন্তু কর্ম্মচ্যুত তহশীলদারকে ডাকিল না। যে দুটি লোক নবিবক্সের সঙ্গে চুরি করিতে আসিয়াছিল, গ্রামের মধ্যে তাহারাই কিছু গুণ্ডা গোছের যুবক। নবিবক্স তাহাদের নাম করে নাই, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। মনিবের ব্যবহার দেখিয়া তাহারা এক-বারেই সিদ্ধান্ত করিল এমন মনিব কখনই আমাদের সর্ব্বনাশ করে নাই।

যত কারসাজি, ছলচাতুরী এই তহশীলদারের। ও কেমন করিয়া গ্রামে থাকে আমরা দেখিব। মনিবের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তি করে ভালই ;—নচেৎ আজই উহার ঘর পোড়াইয়া দিব। আমরা এখনই যাইয়া মনিবের পায়ে ধরিব।

চাষার সিদ্ধান্ত একবারে ঠিক হইলে আর কথা নাই। সেই দিন সন্ধ্যার সময়েই তাহারা দলে দলে জমিদার সাহেবের বাসায় উপস্থিত হইয়া কহিল—"না বুঝিয়া আমরা এমন মনিবের সহিত কলহ করিয়াছি। প্রজা সন্তান। অবোধ সন্তানের অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়।" মিঞাসাহেব সকলকেই অভয় দিলেন। প্রজার সহিত তাঁহার বিবাদ মিটিয়া গেল। অনন্তর তহশীলদারের প্রতি কি ব্যবস্থা হইল তাহা জানিবার জন্য পাঠক বোধ হয় উদ্বিগ্ন নহেন।

পল্লীগ্রামে দুর্গোৎসব।

মাতা। চল্ মা, চল্।

কন্যা। কোথায়?

মাতা। বড় বাড়ী।

কন্যা। আমি যাব না।

মাতা। কেন?

কন্যা। না মা, তুমি যাও।

মাতা। যাবিনি কেন বল্?

কন্যা। যে দুরন্ত ছেলে, ওকে নিয়ে পরের বাড়ীতে যেতে আমার লজ্জা করে।

মাতা। ছেলে দুরন্ত কার না আছে? গ্রামের সব লোকই ত আজ সেই বাড়ীতে।

কন্যা। তা থাক্। তুমি যাও।

মাতা। তুই না গেলে এখনি বড় গিন্নি ডাকতে আস্‌বেন। বড়

গিন্নিই ত তোকে আন্‌তে পাঠিয়েছেন; বেহারাদের টাকা দিয়েছেন। আমাকে ব'লে দিলেন,—'মেয়েকে সঙ্গে করে এখনি এস।'

কন্যা। আমার কি যেতে ইচ্ছা করে না?—তা কি কর্ব্বো! ছেলেটার না আছে একখানা কাপড়, না আছে এক জোড়া জুতো।

মাতা। তা ত বুঝি। যেমন কপাল করেছিলে মা।

এই কথার পরে উভয়ের অপাঙ্গে অশ্রু দেখা দিল।

জননী কন্যাকে বুঝাইলেন,—"বছরকার দিনে চখের জল ফেলো না মা। ওকে মানুষ কর্ত্তে পাল্লে, ও নিজেই নিজের কাপড় জুতো ক'রে নিতে পার্ব্বে।"

মাতার সান্ত্বনায় কন্যার মনোবেগ আরও বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি চক্ষের জল মুছিয়া মাকে কহিল,—"ঐ যে জ্যাঠাইমা আসছেন।"

কিঞ্চিৎ দূর হইতে একটি প্রবীণা রমণী ডাকিলেন,—"সুরির মা, এখনও বসে আছ? এস শীগ্‌গির।"

"যাই দিদি!" বলিয়া সুরির মা উত্তর করিল।

যে রমণী আসিয়া অজ্ঞাতে এই মাতাপুত্রীর অশ্রুস্রোত থামাইয়া দিলেন, তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পরিধান একখান লালপেড়ে শাড়ী। হাতে দুটি শাঁখা ও দুগাছি সোণার বাউটী। নাকে একটি মুক্তা দেওয়া নথ, কপালে খানিক টক্‌টকে সিন্দূর।

২

জেলা নদীয়ার উত্তর পূর্ব্বাংশে বেণীপুর গ্রাম। বেণীপুরের দেবী-প্রসাদ বসু একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। দেবীপ্রসাদের বয়স প্রায় ষাইট বৎসর হইবে। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ গিরিশের এক পুত্র হইয়াছে, তাহার নাম বিজয়। বিজয়ের বয়স চারি বৎসর। কনিষ্ঠ মাধব

এখনও অপত্যহীন। দেবীপ্রসাদের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহার কাল হইয়াছে। বিধবা ভ্রাতৃজায়ার সন্তান নাই। দেবীপ্রসাদের সন্তানেরা তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাকে ছোট মা বলিয়া ডাকেন। ছোট মাই সংসারের কর্ত্রীস্বরূপা। লোককে দেওয়া থোওয়া যা কিছু, সবই ছোট মার হাতে। দামী কাপড় চোপড় গহনা পত্র প্রভৃতি যে সব বাক্সে থাকে, তার চাবিও ছোট মা রাখেন। তিনি বিধবা হইলে দেবীপ্রসাদ ও তাঁহার স্ত্রী সংসারের এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। গ্রামে দেবীপ্রসাদের স্ত্রী ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়া যথাক্রমে বড়গিন্নি ও ছোটগিন্নি নামে পরিচিত।

বোসেরা বুনিয়াদি লোক। বাড়ীর ভিতরে চকমিলানো দোতলা কোটা। বাহির বাড়ীতে পূজার দালান, বৈঠকখানা এবং কাছারি ঘরও পাকা। গ্রামের লোকে তাঁহাদের বাড়ীকে বড় বাড়ী বা বাবুদের বাড়ী বলিয়া থাকে।

৩

দেবীপ্রসাদের বাড়ীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হয়। আমরা কিছু-কাল পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। এই সময়ে বেণীপুরের বোসেদের বাড়ীতে পূজায় বড়ই ধুম হইত। দেবীপ্রসাদ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। দেবতা ব্রাহ্মণে তাঁহার অসীম ভক্তি। পূজা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের হেতু বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। সারা বৎসর ধরিয়া তিনি পূজার উদ্যোগ, পূজার আয়োজন করিতেন। মনে করিতেন, পূজাই হিন্দু গৃহস্থের সাংসারিক নিত্য ব্রতের বার্ষিক উদ্‌যাপন; সংবৎসর আয়োজন উদ্যোগ করিয়া, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে এই উদ্‌যাপনে গৃহস্থের বার্ষিক সঞ্চয়ের অধিকাংশ ব্যয় করা কর্ত্তব্য।

পূজার কয়েক দিন ধরিয়া দেবীপ্রসাদ অকাতরে অসংখ্য লোককে

অন্ন দান করিতেন। কিসে লোকে ভাল খাইবে, কেমন করিয়া কোথা হইতে কি নূতন জিনিস আনা হইবে, পূজার পূর্ব্বে কেবল এই চিন্তাই তাঁহার মনে আসিত। তাঁহার এক আত্মীয় মেদিনীপুরে চাকরি করিতেন; তিনি একবার কতকগুলি মিঠা পান আনিয়া দেবীপ্রসাদকে দিয়াছিলেন। দেবীপ্রসাদ তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন, পূজার সময়ে তুমি এই পান দু' তিন হাজার পাঠাইবে;—আমি দাম পাঠাইয়া দিব। কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরি ভাল বলিয়া দেবীপ্রসাদ প্রতি পূজায় তথা হইতে দু' জন লোক আনাইতেন, এবং বাড়ীতে সরভাজা সরপুরি প্রস্তুত করাইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে খাওয়াইতেন।

বস্তুতঃ, দেবীপ্রসাদ যাহা ব্যয় করিতেন, তাহার অধিকাংশই লোকের আহারের নিমিত্ত। গৃহ-সংস্কার, অলঙ্কার নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য, সেকালের পূজার অঙ্গীভূত ছিল না।

আজ কাল এই ভাবের পূজা কমিয়া আসিতেছে। আমাদের কোনও রহস্যপটু বন্ধু, তাঁহার রচিত একটি তর্জ্জা গানে, দেবদেবী বন্দনার স্থলে, দেবী দশভূজাকে "দ্বাদশ-দিন-ছুটি-প্রদায়িনী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, এখন তেমন ভাবে পূজা করিব, লোক জন খাওয়াইব,—সে প্রাণ, সে ফূর্ত্তি, আমাদের নাই। পূজার সময়ে খাটুনির বিরাম হয় বলিয়াই যেন আমাদের আনন্দ। দেবীপ্রসাদের সময়ে নিয়ম বিপরীত ছিল। তখন সারা বৎসরের পরিশ্রম পূজার ক'দিনে করিতে হইত। বাড়ীর লোকে পূজার তিন দিন প্রায় অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইতেন। রাত্রি দু'টার সময়ে গেলেও দেখা যাইত, হয় দেবীপ্রসাদ, না হয় তাঁহার কোনও পুত্র, আগন্তুকের অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছেন।

জিনিসটা গিয়াছে, বা যায় যায় হইয়াছে; কিন্তু কথাটা আছে। এখনও আমরা "দুর্গোৎসবের ব্যাপার", "দুর্গোৎসবের আয়োজন"

বলিলে, একটা মহাব্যাপার, মহা আয়োজনই বুঝিয়া থাকি। বঙ্গের সাধারণ লোকে ইহাকে বড় পূজা বলিয়া থাকে। শুধু "পূজা" বলিলেও কেবল দুর্গোৎসবই বুঝায়। এমন পূজা ত'আর নাই!

৪

বোসেদের বাড়ীর অতি নিকটে দীননাথ দাস নামে এক দরিদ্র কায়স্থ বাস করিতেন। দীননাথের দু'চারি বিঘা জমি ছিল। তাহার ফসলেই তাঁহার একরূপ চলিয়া যাইত। দীননাথ সামান্যরূপ লেখা পড়া জানিতেন। তিনি শৈশবে অভিভাবকহীন। তদবধি দেবীপ্রসাদের আশ্রিত। অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। দেবীপ্রসাদ সাহায্য করিয়া তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। দীননাথ পাঁচ বৎসরের এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হন। দেবীপ্রসাদের অনুগ্রহে, দীননাথের স্ত্রী কন্যাটিকে কুলীন বরের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অদৃষ্টদোষে সেই কন্যা আঠার বৎসর বয়সে তিন বৎসরের একটি পুত্র লইয়া বিধবা হইয়াছে। শ্বশুরালয়ের অবস্থা তত ভাল নহে। তাহার স্বামীই উপার্জ্জনক্ষম ছিল। মার অবস্থাও আরও শোচনীয়। বিধবা হইবার পর সে একবার আসিয়া মাকে দেখিয়া গিয়াছে। এবারে পূজার কিছু দিন পূর্ব্বে দীননাথের স্ত্রী একদিন দেবীপ্রসাদের গৃহিণীর সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন — "ডুলি ভাড়া দিতে পাল্লে পূজার সময়ে একবার মেয়েটাকে আন্‌তাম।" বড় গিন্নি বলিয়া দেন,—"তুমি তাকে আন্‌তে পাঠাও, বেহারার টাকা আমি দিব।"

দীননাথকে বোসেদের বাড়ীর সকলেই ভাল বাসিতেন; দীননাথ উপকারী লোক ছিলেন। দেবীপ্রসাদ বা তাঁহার কোনও পুত্র যখনই কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছেন, দীননাথ তাঁহাদের সঙ্গে যাইতেন। পুত্রদের সঙ্গে তিনি অভিভাবকের ন্যায় থাকিতেন। প্রয়োজন হইলে

কখনও পাচকের এবং সময়ে সময়ে তিনি চাকরের কাজও করিতেন। কেহই কিন্তু দীননাথকে অবজ্ঞা করিতেন না। দীননাথ দেবীপ্রসাদকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। গিরিশ এবং মাধব তাঁহাকে দীনু খুড়ো বলিয়া ডাকিতেন।

দীননাথের গুণ স্মরণ করিয়া বড় গিন্নি তাঁহার বিধবা পত্নীকেও বড়ই ভাল বাসিতেন। মধ্যে মধ্যে দু'একটি টাকা দিয়া তাঁহার সাহায্য করিতেন। তখনকার দিনের হিন্দুগৃহের পুত্রবতী রমণীরা সাধারণতঃ দয়ার আধার ছিলেন। কুশিক্ষা ছিল না বলিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে স্বার্থপরতা প্রবেশ করিতে পারে নাই।

৫

বেণীপুরে পনের ষোল ঘর কায়স্থের বাস। ষষ্ঠী হইতে বিজয়ার দিন পর্য্যন্ত ইহাদের কাহাকেও উনুনে হাঁড়ি চড়াইতে হইত না। সকলেই পূজাবাড়ীতে প্রসাদ পাইতেন। বেণীপুরে আর কোনও বাড়ীতে পূজা নাই। নিকটে দুই গ্রামে দুই বাড়ীতে পূজা হইত। গ্রামের কেহ কেহ সেখানে গিয়া দুই বেলা নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতেন। বাকি কয় বেলাই বোসেদের বাড়ীতে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার চলিত।

বলা কর্ত্তব্য যে, গ্রামের লোকে যে কেবল নিমন্ত্রিতের ন্যায় উদরের ব্যাপার নিষ্পন্ন করিত, তাহা নহে। পূজার কয়েক দিন ধরিয়া তাহারা প্রায় দিবারাত্রিই বোসেদের বাড়ীতে থাকিত; এবং স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর ভিতরে ও পুরুষেরা বাহিরে, অম্লানচিত্তে ও অক্লান্তদেহে পরিশ্রম করিত। কোনও কোনও বাড়ীতে দু'এক জন বৃদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য লোক থাকিত। কেহ কেহ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ক'দিনের মত আসিয়া বোসেদের বাড়ীতে উঠিত। দুই চারি জন রাত্রিতে বাড়ী যাইত। সকলেই মনে করিত, যেন পূজা গ্রামস্থ সকলেরই। পূজার কথা লইয়া তাহারা অন্য

গ্রামের লোকের সহিত বিবাদ করিত। অন্য গ্রামের কিরূপ যাত্রার বায়না হইল, বা হইবে, তাহার সংবাদ লইয়া তাহারা গিরিশ বাবুকে উস্কাইত,—"ওদের চাইতে ভাল যাত্রা আন্‌তে হবে।"

পূজার প্রধান অঙ্গ দেবার্চ্চনা এবং লোককে আহার দান বৃদ্ধ দেবী-প্রসাদের দৃষ্টির বিষয় ছিল। যাত্রা প্রভৃতি আমোদের জন্য গিরিশ বাবুর কথায় যুবকেরা খাটিত। কোনও কার্য্যে কোথাও যাইতে হইবে শুনিলে, গ্রামের লোক এক জনের যায়গায় পাঁচজন প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইত।

সময়ের পরিবর্ত্তনে পল্লীগ্রামের এ ভাবও চলিয়া যাইতেছে। শিক্ষায় আমাদের পরশ্রীকাতরতা কমাইয়াছে সত্য, কিন্তু সেকালের সে সরলতা ও মেশামিশির ভাবটা যেন লোপ পাইতেছে। তখন অশিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেক সময়ে দলাদলি থাকিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে গ্রামে দেবীপ্রসাদের ন্যায় লোকের বাস, সেখানে পরস্পরের মধ্যে বড়ই সদ্ভাবও প্রীতি লক্ষিত হইত। এখন আমরা স্ব স্ব প্রধান। স্বাতন্ত্র্য ভাবটা আমাদের অতিশয় প্রবল। পরের বাড়ী যাইয়া কোনরূপ কাজ কর্ম্ম করা আমরা অপমানসূচক মনে করি। কিন্তু দেবীপ্রসাদের বাড়ীতে তাহার প্রতিবেশী ভদ্র সন্তানেরা কেহ ময়দা ঠাসিত, কেহ নিমন্ত্রিতের আহারের স্থান করিয়া দিত, এমন কি আগন্তুক ব্রাহ্মণের পা ধুইবার জল আনিয়া দিত ;—ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

দীননাথের কন্যার নাম সুরধুনী। কিন্তু বাপের বাড়ীতে এখনও সেই শৈশবের সুরি নাম ঘুচে নাই।

১২৭৯ সালের দুর্গোৎসবের সপ্তমী পূজার দিন বেলা তিনটার সময় সুরি পিত্রালয়ে পঁহুছে।

গ্রামের যে সকল বিধবার অন্য বিধবার হাতে খাইতে আপত্তি নাই, তাঁহাদেরই জন্য দীননাথের স্ত্রী বোসেদের বাড়ীতে রন্ধন করিতেছিলেন।

রন্ধন শেষ হইলে, তিনি গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িতে যাইবেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন, তাঁহার কন্যা আসিয়াছে। তিনি ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন ; বড় গিন্নিকে বলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী গেলেন।

দু'চারি কথার পরেই জননী কন্যাকে বড় বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দুঃখিনী বিধবা তাহাতেই আপত্তি করিতেছিল। মনে ব্যথা থাকিলে, আমোদের বা উৎসবের স্থানে যাইতে ইচ্ছা হয় না।

এ দিকে দীননাথের স্ত্রীর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া দেবীপ্রসাদের গৃহিণী অন্য একটি বিধবাকে তাহাদের অন্ন পরিবেশন করিতে বলিয়া, নিজে সুরির মাকে ডাকিতে গেলেন।

বেলা শেষ হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের জলপান, কায়স্থদের ভোজন ও সধবাদিগের আহার হইয়া গিয়াছে। দুঃখী, কাঙ্গালী ও চাকরেরাও খাইয়াছে। কেবল বিধবাদের আহার বাকি। গৃহিণী ছুটাছুটি করিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও জল-গ্রহণ করেন নাই। আরতি শেষ হইয়া গেলে কর্ত্তা আহার করিবেন। গৃহিণী তার পরে।

তিনি ডাকিবামাত্রই দীননাথের স্ত্রী ও কন্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। রন্ধনশালার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দেবীপ্রসাদের গৃহিণী কহিলেন,—"সুরির মা, সুরিকে খাইয়ে দাও, তুমি খাও, আমি দেখে আস্‌ছি—মাছ আছে কিনা। ওর ছেলেটাকে দু'খানা মাছ দিতে বলি।"

সুরধুনী বলিল,—"আপনি আর মাছ দেখতে যাবেন না। খোকা আমার সঙ্গেই যা হয় দুটো খাবে এখন।"

গৃহিণী জিদ্ করিলেন,—"কেন রে? মাছ আছে। তোর ছেলেকে আমার সঙ্গে দে। আমি ওকে মাছের ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়ে খাইয়ে দিচ্ছি।"

সু। না জ্যাঠাই মা, ও ভারী দুরন্ত।

গৃহিণী। হ'ক দুরন্ত। দুরন্তপনা কল্লে ওর কাণ কেটে দেবো।

এই বলিয়া তিনি সুরধুনীর ছেলেটির হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন,—"সুরি, খাওয়া হ'লে তোর ছেলেকে নিয়ে উপরে বউ-মাদের কাছে যাস। সুরির মা! সুরিকে নিয়ে এস।"

৭

আহারান্তে অনিচ্ছাসত্বেও সুরধুনী পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া উপরে গেল। উপরে এক সারি ঘর আছে। সেগুলির জানালা হইতে বাহির বাড়ীতে দৃষ্টি চলে। সমস্ত জানালাতেই চিক্ দেওয়া। সুরধুনী দেখিল, এই ঘরগুলি স্ত্রীলোকে পূরিয়া গিয়াছে। গ্রামের প্রায় সকলেই, এবং কুটুম্বা-লয়ের অনেকেই সেখানে সমাগত। তাহাদের শিশুপুত্রকন্যারাও অবশ্য সেখানে। কেহ ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন; কাহারও ছেলে ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে; কেহ বা ছুটাছুটি করিতেছে। গিরিশ বাবুর পুত্র বিজয় খেলিতেছিল। তার মা মাধবের স্ত্রী ও অন্য দু'এক জনকে সঙ্গে লইয়া পান সাজিতেছিলেন।

পূজার সময়ে পান সাজা, জল খাবার সাজানো, ইত্যাদি মিহি কাজের ভার যুবতীদিগের উপর। রন্ধন, পরিবেশন প্রভৃতি মোটা এবং পরিশ্রমের কাজ প্রৌঢ়ারা করিয়া থাকেন।

সুরধুনীর জননী তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সিঁড়ির উপর থাকিয়াই তিনি কন্যাকে কহিলেন,—"যা, ঐ যে বউমারা পান সাজ্ছেন্।" তিনি সরিয়া যাইতেই বড় বধূ ডাকিলেন,—"এস ঠাকুরঝি, এস। আয় বসন্ত, আয়।"

সুরধুনীর ছেলের নাম বসন্ত। সে মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছিল।

বসন্তের চেহারা মন্দ ছিল না। চক্ষুর্দ্বয় মেধাব্যঞ্জক। কিন্তু মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে দরিদ্রতার কালিমা-মাখানো।

বড় বধূ কহিলেন,—"ঠাকুরঝি! তোমার ছেলে বিজয়ের সঙ্গে খেলা করুক; তুমি এসে সুপুরি কাটো, কি পান সাজো।"

সুরধুনী কহিল,—"ছেলেটি আমার বড় ঠাণ্ডা নয়।"

বড় বধূ। ঠাকুর জামাই ত খুব ঠাণ্ডা ছিলেন। ছেলে অমন হ'ল কেন?

এই কথায় ছোট বধূর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সুরধুনী কোনও উত্তর না দিয়া ছেলেটিকে বিজয়ের কাছে দিয়া আসিল। সে দেখিল, তখনও রাশীকৃত পান সাজিতে বাকি র'হয়াছে। সে বড় বধূ ও ছোট বধূর সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল।

তখন পল্লীগ্রামে যাত্রার কাছে পানের দোকান বসিত না। আজ কাল বসে। শ্রোতৃবর্গ সে সময়ে পূজাবাড়ী হইতেই পান পাইতেন।

৮

বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে। দেবীপ্রসাদ পূজার দালানেই বসিয়া আছেন। প্রত্যূষে প্রাতঃস্নান করিয়া তিনি সেখানে গিয়াছেন। পূজা কোনও রূপে অঙ্গহীন না হয়, কোনও অভ্যাগতের প্রতি আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়, ইহাই তিনি দেখিতেছেন। পূজা শেষ হইয়া গেলে ব্রাহ্মণদিগের জলপান, কায়স্থদিগের ভোজন, কাঙ্গালীর আহার, তিনি দেখিয়াছেন। দেবীপ্রসাদের আদর ও যত্ন অন্তরে ও ব্যবহারে, মুখে তেমন প্রকাশ নাই। পাঁচটার সময়ে একজন বৈরাগী আসিয়া রামপ্রসাদের শান্তিরসাত্মক গান গাইতেছে। দেবীপ্রসাদ ও সমাগত লোকেরা তাহাই শুনিতেছেন। গীত শেষ হইলে একটা শব্দ উঠিল,—"শীতল চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়াছেন!"

শীতল একজন ভোজনপটু ব্রাহ্মণ। প্রতি বৎসরই পূজার সময়ে ইনি আসিয়া থাকেন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ঠিক নাই। সাধারণতঃ ইনি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দেখা দেন। দেবী-প্রসাদের বাড়ীতে পূজার ক'দিন ব্রাহ্মণ-যে কোন সময়ে আসিলেই আহার পান।

শীতল কায়স্থের বাড়ীতে লুচি তরকারি ইত্যাদি খান না। খান শুধু দই, ক্ষীর, আর মিষ্টি। তাহাই এমন খান যে, তাঁহার জল খাওয়া দেখিবার জন্য লোক দাঁড়াইয়া যায়। কথিত আছে যে, ১২২৫ সালে যে সমস্ত উদরসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ নলডাঙ্গার রাজবাড়ীতে আহার করিয়া মর্ত্ত্যধামে নিদারুণ বিসূচিকা রোগ আনয়ন করেন, শীতলের পিতা তাঁহাদের মধ্যে একজন। আহারের নিমিত্ত শীতল কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা পাইয়া থাকেন।

শীতল পাদপ্রক্ষালন করিলেন। তাঁহার জলযোগের উদ্যোগ হইতে লাগিল। চারিদিকে লোক ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উপর হইতে রমণীগণ দেখিতে লাগিলেন। শীতলের বয়স সত্তর বৎসর হইবে। কিন্তু এখনও তাঁহার শরীর দেখিলে বুঝা যায় যে, যৌবনকালে তিনি একজন বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন।

দেখিতে দেখিতে শীতল দু'সের ক্ষীর, তিন সের রসগোল্লা, চারি সের সন্দেশ ও পাঁচ সের দধি উদরস্থ করিলেন। আহারান্তে কহিলেন, "আর সে দিন নাই, আহার কমিয়াছে!" দেবী-প্রসাদ তখনও জিদ্ করিতে লাগিলেন, "আর কিছু নিন্।" তিনি তাঁহাকে ইহা অপেক্ষাও অধিক আহার করিতে দেখিয়াছেন।

৯

আচমন করিয়া হরীতকী চর্ব্বণ করিতে করিতে শীতল গল্প আরম্ভ করিলেন, "দাদা গেছ্‌লেন একবার গঙ্গাস্নানে। কাঁচড়াপাড়ার বৈদ্যদের

নাম শুনে ভাবলেন, কিছু ওষুধ নিয়ে যাই। দাদার তখন একটু অগ্নি-মান্দ্যের মত হ'য়েছিল। তাতেও কিন্তু তিন সের চালের অন্নধ্বংস কর্ত্তে পার্ত্তেন। রাস্তায় এক বাড়ীতে অতিথি হন। গৃহস্থ রীতিমত সিধে দেয়। দাদা সেই আধ সের আন্দাজ চাল, চালজলের মত খেয়ে বসে আছেন। খানিক বাদে বাড়ীর কর্ত্তা এসে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—'আপনি পাক কচ্ছেন না?' দাদা উত্তর কল্লেন,—'চাল পাই নি।' 'চাল দিয়েছিল ত?' 'সে অল্প, সে দুটো আমি চাল-জল খেয়েছি।' শেষে গৃহস্থ তিন চারি সের চাল আনিয়া দিলেন। রন্ধন শেষ করিয়া দাদা আহারে বসিলে গৃহস্থ এসে দেখেন যে, সব গুলি অন্নই উঠে গেল। আহার হয়ে গেলে তিনি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু, কোথায় যাচ্ছেন?' দাদা বল্লেন, কাঁচড়াপাড়া।' 'কেন?' উত্তর হ'ল 'চিকিৎসার জন্য।' 'আপনার ব্যারাম কি?' অল্পদিন থেকে কিছু অরুচি হয়েছে। গৃহস্থ আর কিছু না বলিয়া কহিলেন, 'চিকিৎসা হবার পরও কি এই দিক দিয়া ফিরিবেন?"

চারিদিকে হো হো হাসির শব্দ পড়িয়া গেল। ভোজন সম্বন্ধে শীতলের অনেক গল্প ছিল। "বেলা শেষ হইল" বলিয়া তিনি আর বসিলেন না। দেবীপ্রসাদ তাঁহাকে দক্ষিণা ও প্রণামী দিয়া বিদায় করিয়া, প্রণামান্তে হাস্যমুখে কহিলেন, "মধ্যে মধ্যে যেন পায়ের ধূলা পড়ে।"

এখনকার দিনে শীতলের ন্যায় ব্রাহ্মণ বা অতিথি দেখিলে, আমরা বোধ হয় তাড়াইয়া দিতে পারিলে বাঁচি। দেবীপ্রসাদ তাঁহাকে জিদ্ করিয়া আকণ্ঠ পূরিয়া খাওয়াইলেন। সমাজের দেবীপ্রসাদেরা পলায়ন করিতেছেন বলিয়াই শীতলের ন্যায় ব্রাহ্মণেরও অন্তর্দ্ধান হইতেছে। শীতলের বংশধরেরা নানা উপায়ে উদরাগ্নি নির্ব্বাণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। সে বারে পল্লীগ্রামের এক পূজায় আমরা প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ পুরোহিত দেখিয়া আসিয়াছি।

ব'লতে পার, সময়ের সহিত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দশ জন লোককে আহার দিতে যাহা লাগিত, এখন হয় ত চারি জন লোককে খাওয়াইতে তাহাই লাগে। তখনকার দিনে যে ব্যয়ে সংসার চলিত, এখন তাহাতে চলে না। ইহাও ঠিক যে, এক এক কন্যার বিবাহেই অনেকের উপর সেকালের দুই দুর্গোৎসবের চাপ পড়ে। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের মধ্যে অন্নদান, বস্ত্রদান প্রভৃতির প্রবৃত্তি ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। এখন আমাদের মৌখিক সৌজন্য ও শিষ্টাচারের কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। কিন্তু মনে মনে যেন আমরা অনেকেই এই বিলাতী মত পোষণ করিতে শিখিতেছি যে, "বর্ব্বরেরা দেয় খানা, বুদ্ধিমানে খায়।"

১০

বসন্ত, বিজয়ের প্রতি হুকুম চালাইতে লাগিল। বিজয় বড়মানুষের ছেলে, আর সে দরিদ্র, এ পার্থক্য বুঝিবার বয়স এখনও তাহার হয় নাই। পৃথিবীর পার্থক্য, অত্যাচার প্রভৃতি বুঝিতে পারে না বলিয়াই ত' শিশুরা এত সুখী!

অল্পক্ষণেই বসন্ত তাহার দুরন্তপনা দেখাইল। আধ ঘণ্টা না যাইতে যাইতেই সে বিজয়ের দুই তিনটি খেলনা ও কাঁচের পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বিজয় শেষে বড়ই চটিয়া গেল। "যাও, তোমার সঙ্গে খেল্‌ব না" বলিয়া সে তাহাকে এক ধাক্কা মারিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে ছোট গিন্নি আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন,—"ছি দাদা, ওকি? তোমার বাড়ীতে পূজো; তোমার কি কাউকে কিছু বল্‌তে আছে?"

বিজয় ভাঙ্গা জিনিস গুলি দেখাইয়া কহিল,—"দেখ ত কি করেছে?"

ছোট গিন্নি কহিলেন,—"তা করুক। আমি কালই আবার ও সব তোমাকে এনে দেব।"

বিজয় ইহাতেই চুপ করিল।

বিজয় ও বসন্ত দৃষ্টির বাহিরে থাকিলেও, সুরধুনীর কাণ সেই দিকেই ছিল। শীতল চক্রবর্ত্তীর জলযোগ তাহাকে একটু অন্যমনস্ক করিয়াছিল। সহসা ছোট গিন্নির কথা তাহার কাণে প্রবেশ করিল। সে নিশ্চয় বুঝিল, পুত্র কিছু অন্যায় কাজ করিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সে ভাঙ্গা খেল্না দেখিতে পাইল, এবং বসন্তের গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল।

বসন্ত অবশ্য কাঁদিয়া উঠিল। ছোট গিন্নি বিজয়কে ছাড়িয়া দিয়া বসন্তকে কোলে করিলেন। অশিষ্ট বালক মাকে ফিরাইয়া মারিবার জন্য পুনঃ পুনঃ কোল হইতে নামিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ছোট গিন্নি তাহাকে নামিতে দিলেন না, কিন্তু তাহার মাকে বকিতে লাগিলেন,—

"বছরকার্ দিনে ছেলেটাকে মাল্লি কেন? তুই ভারী যা'চ্ছেতাই।"

সু। ওকে নিয়ে আমার কোথাও মুখ পাবার যো নাই, খুড়ীমা। এই ছেড়ে দিয়ে গিয়েছি, দেখ, এর মধ্যেই কি কারখানা ক'রেছে—

ছো। কি কর্বি তা ব'লে? ছেলে মানুষ বুদ্ধি হ'লেই সেরে যাবে।

এই সময়ে বড় গিন্নি উপরে আসিলেন। "কি, হয়েছে,—কি?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করায়, ছোট গিন্নি তাহাকে সমস্ত কহিলেন।

বড় গিন্নিও বসন্তের গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুরধুনীকে বকিতে আরম্ভ করিলেন।

সুরধুনী অপ্রস্তুত হইয়া পান সাজিবার জায়গায় ফিরিয়া গেল।

বড় গিন্নি ছোট গিন্নিকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে গিরিশ বাবু উপরে আসিলেন, এবং কহিলেন, "ছোট মা! আমি নিমন্ত্রণ খেতে যাই।"

ছোট মা। কেন, মাধব? সে যাবে না?

গি। মাধবের মাথা ধরেছে,—ক'দিন যে খেটেছে। বাবা বল্লেন আমাকে যেতে।

ছোট মা। যাও, রাত ক'রো না। শীগ্‌গির ফিরে এস।

গি। যেমন যাব, অমনই আস্‌ব। নৌকায় যাচ্ছি। জ্যোৎস্না রাত আছে।

ছোট মা। মাধবকে উপরে এসে শুয়ে থাক্‌তে বল।

বসন্ত তখনও ছোটমার কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কাঁধে চাদর ফেলিতে ফেলিতে গিরিশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও কে ছোট মা?"

ছোট মা। চিনতে পাল্লে না? তোমার ও বাড়ীর খুড়োর নাতি।

গি। আমি ওকে খুব ছেলেবেলায় দেখেছি। মধ্যে ওরা একবার এসেছিল। আমি তখন বাড়ী ছিলাম না। ওর মা এসেছে বুঝি?

বড় মা নিকটেই ছিলেন। তিনি কহিলেন,—"হাঁ, আমিই আন্‌তে পাঠিয়েছিলাম।"

বড় মা আসিয়া ছোট মা ও গিরিশ বাবুর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং আস্তে আস্তে দু'জনকেই কহিতে লাগিলেন,— "মেয়েটা শ্বশুরবাড়ীতে বড়ই কষ্টে থাকে। তাদের কিছু নাই। দেখতে পাচ্ছ না ছেলেটা কি হালে এসেছে।"

ছোট মা কহিলেন,—"ওর মা ত পাবেই, ওকেও এক যোড়া কাপড় দিতে হয়।"

বড়। তাই একটু ভাল দেখে। আমি যখন ওর মাকে আর দিদিমাকে ডাকতে যাই, তখন বোধ হয় মায়ে ঝিয়ে কাঁদ্‌ছিল। আমি ডাকতেই দু'জনে উঠে এল। দেখ্‌লাম, দু'জনেরই চোখ ভিজে ভিজে।

ছেলেটার না আছে কাপড়, না আছে জুতো, বোধ হয়, তাইতে সুরি আসতে ইতস্ততঃ ক'চ্ছিল।

গি। কি ক'রবো! এখানকার দোকানে ত ভাল দেশী কাপড় নাই। আমাদের পূজোর কাপড়ও প্রায় বিলি হয়ে গেছে। যদি একটু আগে বল্‌তে। ছেলেপিলের কাপড় ত খুব বেশী আনা হয় না।

বড়। খোকা পূজোয় যে সব কাপড় পেয়েছে, তার এক যোড়া দিলে হয় না?

গি। বেশ হয়, ওরা ত এক-বয়সী। ছোট মা, খোকার এক যোড়া কাপড় এনে ওকে দাও। দীনুখুড়ো যে ভালবাসতেন আমাদের—তাঁর নাম রাখতে ত আছে কেবল ঐ।

বলিতে বলিতে ছোট মা এক যোড়া রেশমী-পেড়ে দেশী কাপড় লইয়া আসিলেন। সুরধুনীকে ডাকিলেন, 'সুরি! এ দিকে আয়।"

সুরধুনী আসিয়া গিরিশের পায়ে প্রণাম করিল। ছোট মা কহিলেন,—"তোর দাদা তোর ছেলেকে এই কাপড় দিলেন।"

কাপড় যোড়া হাতে লইয়া সুরি এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিল কহিল,—"এত ভাল কাপড় নিয়ে ও কি ক'রবে?"

গি। তা হ'ক, তুই নে। আমি তোর ছেলের এক যোড়া জুতে কিনে দেবো। একটা পোষাক ক'রে দেবো।

সু। পোষাক টোষাক চাইনে দাদাবাবু, ওকে মানুষ ক'রে দেবেন

গি। তা দেবো।—ও বেঁচে থাক্, ওকে বিজয়ের সঙ্গে রেখে দেবো

সুরধুনীর গণ্ড বহিয়া অশ্রু ছুটিল।

দরিদ্রা বিধবার প্রাণের আশীর্ব্বাদ কুড়াইতে কুড়াইতে গিরিশচন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

এই সময়ে নীচে কাঙ্গালী-বিদায়ের ন্যায় একটা গোল উঠিল। নিক

টস্থ যে সমস্ত সামান্য গৃহস্থদের স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রতিমা দেখিতে আসে, তাহারা বোসেদের বাড়ীতে তেল, পান, সুপারি পাইয়া থাকে। সেই সকল স্ত্রীলোকে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে।

ইহার একটু পরেই সান্ধ্য আরতি ;—তার পর নৈশ আহার ; পরে ক্ষণিক আরাম ; শেষে সেই সাবেকী আমোদ—যাত্রার আয়োজন।

পূজা একদিনও যা, তিন দিনও তা। আমরা এক দিনের তিন ঘণ্টার সামান্য চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র ; পল্লীগ্রামে এখনও দু'একজন বৃদ্ধ হিন্দুর বাড়ীতে দেবীপ্রসাদের পূজার ন্যায় পূজা হইয়া থাকে। কিছু দিন পরে হয় ত এমন পূজা আর দেখিতে পাইব না !

মাণিক সর্দ্দার।

চল, বাবা, চল।

মা, আমার বুঁঝি জ্বর এলো।

১২—সালের মাঘ মাসের শেষে এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ময়মনসিংহের এক ক্ষুদ্র পল্লীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ প্রান্তরে কোন দরিদ্র মাতাপুত্রে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল। ইহারা নমঃশূদ্রজাতীয়। রমণী বিধবা। বয়স অনুমান ২৫।২৬ বৎসর হইবে। একমাত্র সন্তান আট নয় বৎসরের বালক মাণিক তাহার সঙ্গে মাঠে আসিয়াছে। মাণিক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। চারি পাঁচ মাস হইল, তাহাকে জ্বরে ধরিয়াছে। সে দু'এক দিন ভাল থাকে, আবার জ্বর হয়। তাহার পেটে প্লীহা দেখা দিয়াছে। হাত পা শুকাইয়া আসিয়াছে। উদরটী স্ফীত হইয়াছে। বিবর্ণমুখের দিকে দৃষ্টি করিলেই শরীরে রক্তের অভাব অনুমিত হয়।

রমণীর অবলম্বন এই এক পুত্র। তাহার স্বামী ফটিকমণ্ডল, এক বৎসরের অধিক হইল, পরলোক গমন করিয়াছে। বিধবার নিকট সম্পর্কের আত্মীয় স্বজন কেহই নাই। শ্বশুরকুল একেবারেই শূন্য। পিত্রালয়ে এক পিতৃব্য আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর রমণী তাহার বাটীতে যাইয়া কয়েক মাস বাস করিয়াছিল; কিন্তু পিতৃব্যপত্নীর নির্ম্মম ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া,

রুগ্ন পুত্রটী লইয়া স্বামার শূন্য ভিটায় ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং গ্রাম্য জমিদার ও অন্য কয়েকটী লোকের অনুগ্রহে সেখানে এক ক্ষুদ্র চালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেছে। সম্বলের মধ্যে তাহার একটী গাভী। ফটিকের জমিজমা কিছুই ছিল না এমন নহে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে সে অনেক দিন রোগ-শয্যায় শায়িত ছিল, সুতরাং উপার্জ্জনের ক্ষমতা ছিল না। অনন্যোপায় হইয়া ফটিক কেবল বাস্তুভিটাটী রাখিয়া অন্যান্য সমস্ত জমিই ছাড়িয়া দিয়াছিল। ফটিকের পালে সাত আটটী গরু ছিল। ফটিক নিজেই তাহার কয়েকটী বেচিয়া যায়। যাহা অবশিষ্ট ছিল, স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার শ্রাদ্ধাদির জন্য মাণিকের মা সমস্তই বেচিয়া ফেলে। কেবল একটী অল্প বয়সের গাভী রাখিয়া দেয়। বলা বাহুল্য রমণী এই গাভীটীকে অতিশয় যত্ন করিত। তাহার গায়ে একটু ময়লা দেখিলে, অঞ্চল দিয়া মুছিয়া দিত। রাত্রিতে গাভিটীকে কুটীরের এক অংশে রাখিত এবং সাধ্যমত তাহাকে দংশ মশকাদির উপদ্রব সহিতে দিত না। গাভীটীও যেন পালিকার আদব যত্ন বুঝিতে পারিত। পশু হইলেও তাহার প্রতিদান সামান্য ছিল না। অসহায়া বিধবা তাহার দুধ বেচিয়াই একরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন দোহনান্তে রমণী গাভীটীকে মাঠে বান্ধিয়া দিয়াছিল। ক্ষুদ্র বৎস নিকটে চরিয়া বেড়াইতেছিল। মাঠের অন্য এক স্থানে এবং তাহার বাড়ীর কিছু নিকটে একটী ভাগাড়ে সে গোবর ভাঙ্গিয়া কতকগুলি ঘুঁটে শুকাইতে দিয়াছিল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সে পুত্রের সহিত মাঠে আসিয়া সেই ঘুঁটে কুড়াইয়া একটী ঝাঁকা পূরিয়া গরুটী আনিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল এবং পুত্রকে সঙ্গে যাইতে কহিতেছিল। পুত্রের কথা শুনিয়া সে একবার তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিল এবং পুত্রকে ঝাঁকার নিকটে বসাইয়া নিজে গরু

আনিতে ছুটিল। যেখানে গরু বান্ধিয়াছিল, সেখানে কিছুই দেখিতে পাইল না। রমণীর মস্তক ঘুরিয়া গেল। যে স্থানে খোঁটা পুতিয়াছিল তথায় একটী ছিদ্র দেখিতে পাইল, কিন্তু গরুতে খোঁটা উপড়াইয়া গেলে যেমন দাগ পড়ে, তেমন কিছু দেখিতে পাইল না। মানুষে উঠাইয়া লইলে ছিদ্র যেমন প্রায় সমানই থাকে, তাহাই ছিল। মাণিকের মা মনে করিল, এ বুঝি অন্য কোন গরুর খোঁটার চিহ্ন ; আমি হয়ত আরও কিছু দূরে বাঁধিয়াছি। রমণী কিছু দূর অগ্রসর হইল, কিন্তু মাঠশূন্য। দরিদ্র বিধবার হৃদয়ও শূন্য বোধ হইতে লাগিল। গরুটীর প্রতি তাহার কত মমতা, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সে কিছুকাল পাগলের ন্যায় এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিল, গরুর কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। সহসা তাহার মনে হইল, জ্বরো ছেলে মাঠে বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। রমণী রুদ্ধশ্বাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মাণিক তখন ঘুঁটে গুলি—সম্মুখে রাখিয়া জ্বরে কাঁপিতেছে ও কাঁদিতেছে। মাতা তাহা লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই কিছু দূরে থাকিতেই পুত্রকে ডাকিয়া কহিল,—"বাবা মাণিক, আমাদের মেনিকে বুঝি চোরে নিয়াছে।" মাণিকের মা গাভীটীকে মেনি বলিয়া ডাকিত।

মাতার হস্তে গাভীর রজ্জু না দেখিয়াই মাণিকের মন উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। এখন তাহার কথা শুনিয়া রুগ্ন বালক আরও কাঁদিয়া উঠিল।

রমণী ঘুঁটের ঝাঁকাটী বাম কক্ষে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে পুত্রের হস্ত ধরিয়া আস্তে আস্তে বাড়ীমুখে চলিল।

বালক নিজের জ্বরের কথা ভুলিয়া গরুর কথাই ভাবিতে লাগিল। দরিদ্র বিধবা এক একবার মনে ভাবিতে লাগিল—গরুটী হয় ত ছুটিয়া এতক্ষণে অন্য পথে বাড়ী আসিয়াছে। বাড়ী আসিলেই কিন্তু তাহার সে আশা নির্ম্মূল হইল।

মাণিকের জন্য সামান্য শয্যা রচনা করিয়া রমণী এক প্রতিবেশিনীর কন্যাকে ডাকিল এবং তাহাকে বালকের নিকট বসিতে বলিয়া গরুর অনুসন্ধানে বাড়ীর বাহির হইল।

২

মাণিকের মা গরুটীর অনুসন্ধানে গ্রামের অনেক বাড়ীতেই গেল, কিন্তু কোন স্থানেই গরুর সন্ধান পাইল না। রাত্রি অর্দ্ধ প্রহর অতীত হইলে, সে গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার রামকিশোর চৌধুরীর ভবনে উপস্থিত হইল। রামকিশোর বহির্বাটীতে বসিয়াছিলেন। রমণী একজন ভৃত্যকে কহিল,—"কর্ত্তাকে বল, আমার গরুটী আজ চোরে নিয়াছে।"

রামকিশোর বয়সে বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র যাদবকিশোরই চল্লিশ ছাড়াইয়া গিয়াছেন। যাদবের এক পুত্র হইয়াছে, তাহার বয়স তিন বৎসর মাত্র। নাম ললিতকিশোর। ফটিক মণ্ডল রামকিশোরের বড়ই বাধ্য ও অনুরক্ত প্রজা ছিল। যে কোন কাজে ডাকিলেই তাহাকে হাজির পাওয়া যাইত। রাত্রিতে সে অনেক সময়ে রামকিশোরের বাড়ী পাহারা দিত। রামকিশোর তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। রমণী এই সাহসেই রাত্রিতে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছিল। রামকিশোর কিছুমাত্র বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া ভৃত্যকে দিয়া তাহাকে দু'-চারিটী প্রশ্ন করাইলেন, এবং শেষে কহিয়া দিলেন, ওকে বাড়ী যেতে বল, আমি ওর গরুর অনুসন্ধান করাইব।

রামকিশোর যাহা বলিলেন, তাহা করিলেন। সেই রাত্রিতেই পার্শ্বস্থ দু'এক গ্রাম এবং নিকটস্থ খোঁয়াড় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত দুই জন লোক প্রেরিত হইল, তাহারা ব্যর্থচেষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিলে, পরদিন প্রত্যূষে তিনি তিন চারি জন কর্ম্মঠ লোক তিন চারি দিকে প্রেরণ করিলেন। ইহারা সকলেই তাঁহার বাধ্য ও অনুগত প্রজা।

রামকিশোর বড় জমিদার ছিলেন না, তাঁহার ভূসম্পত্তির বার্ষিক আয় তিন সহস্র মুদ্রার অধিক নহে, প্রজার সংখ্যা দুই তিন শত হইবে। রামকিশোর কোন কার্য্যে আহ্বান করিলে, এক ঘণ্টার মধ্যে এক শত লোক সংগ্রহ করিতে পারিতেন। তিনি যে নিজে বড়ই শিষ্ট শান্ত লোক ছিলেন, তাহা নহে; প্রজামণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার অসীম ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ছিল। প্রজায় প্রজায় কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে, বা কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিলে, অনেক স্থলেই তিনি হাকিমভাবে তাহার বিচার করিতেন। কাহাকেও দুই দশ ঘা জুতা মারিলেও সে তাহা নীরবে সহ্য করিত, দু'পাঁচ টাকা জরিমানা করিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিত। তজ্জন্য কেহই দুকুড়ি পাঁচ আইনের আশ্রয় লইতে যাইত না। রামকিশোর যাহা করিতেন, তাহাকে প্রজা পীড়ন নাও বলা যাইতে পারে; কেন না ইহাতে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনই হইত। প্রজাগণ তাঁহাকে ভালবাসিত। কোন প্রজার বিপদে তিনি যেমন সাহায্য করিতেন, তেমনই অনেক প্রজাও তাঁহার কার্য্যে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল। এই ভাব ছিল বলিয়াই মাণিকের মায়ের গরু খুঁজিবার জন্য যাহাকে ডাকাইলেন, সেই অম্লান-চিত্তে যাইতে স্বীকার করিল।

অধুনা বঙ্গে প্রজা জমিদারের মধ্যে এইরূপ বাধ্যবাধকতার ভাব ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। জমিদারও প্রজাকে সেই সাবেক স্নেহের চক্ষে আর দেখেন না, প্রজাও তাঁহাকে আর তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করে না। ভূস্বামীর বাড়ীতে কোন ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে দুখানি কদলীপত্র সংগ্রহ করিতে বলিলে, আজ কাল তদুপলক্ষে স্থানে স্থানে ফৌজদারি, মোকর্দ্দমা হইয়া থাকে। অধুনা অনেক স্থলে কেবল খাজানার দেনা পাওনা ব্যতীত প্রজা ভূস্বামীর মধ্যে অন্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

রামকিশোরের অনুগ্রহে আট দিনের মধ্যেই মাণিকের মার গরুর সন্ধান হইল। একটা পুরাতন দাগী চোর গাভীটী চুরি করিয়া তাহার পরদিনই আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক স্থানে উহা বিক্রয় করিয়াছিল।

গরু ধরা পড়িল বটে, কিন্তু তাহার উদ্ধারার্থ মাণিকের মাকে বিলক্ষণ কষ্ট সহ্য করিতে হইল। তাহাকে দুইবার পনর ক্রোশ দূরবর্ত্তী ময়মনসিংহ সহরে যাইতে হইল। গরু লইয়া যে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা হয়, এক মাজিষ্ট্রেট প্রথমতঃ তাহার বিচার করিয়া আসামীকে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন। দুই মাস পরে সেখানে বিচার হইয়া, আসামীর সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়, এবং মাণিকের মা তাহার গরুটী ফেরত পায়। গ্রীষ্মকালে রমণীকে দুইবারে ত্রিশ ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইল। অনভ্যাস বশতঃ প্রথম বারেই তাহার পা ফুলিয়া গিয়াছিল, এবং সর্ব্ব শরীর অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছিল; দ্বিতীয় বারে রমণী দুশ্চিকিৎস্য রোগ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

৩

মাণিকের মার রক্ত আমাশয় হইয়াছে। বার তের দিন হইল সে শয্যাগত হইয়া রহিয়াছে। রুগ্ন পুত্র মাণিক, চৌধুরীদের বাড়ীতেই আহারাদি করে। অনেক সময়েই সে জননীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকে, এবং তাহার কাতর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে। রামকিশোরের দয়ায় মাণিকের মার চিকিৎসার যথাসম্ভব বন্দোবস্ত হইয়াছিল; তাহার পথ্য চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে প্রস্তুত হইত এবং মাণিক তাহা হাতে করিয়া আনিয়া মায়ের মুখে দিত। রামকিশোরের বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণী দুই তিন দিন আসিয়া মাণিকের মাকে দেখিয়া গিয়াছেন। আজ প্রাতঃকাল হইতেই মাণিকের মার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিয়াছে, রামকিশোরের আদেশ বা অনুরোধে যে গ্রাম্য চিকিৎসক

তাহাকে দেখিতেছিলেন, তিনি আজ জবাব দিয়া গিয়াছেন। মাণিক আজ আর চৌধুরী বাড়ী যায় নাই। একটী ভৃত্য তাহার জন্য দুটী ভাত আনিয়া দিয়াছিল, তাহাই খাইয়াছে।

বেলা অনুমান চারি দণ্ড থাকিতে মাণিকের মা রোগ-যন্ত্রণায়, বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল এবং কেবল ছটফট করিতে লাগিল। সে তাহার নিজের অবস্থা বুঝিতে না পারিয়াছিল এমন নহে। অন্তিম সময় নিকট জানিয়া সে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল—"একবার কর্ত্তাকে কেঁউ ডেকে আন। আমি তাঁহার চরণ ধূলি নিব।" প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশিনী অনেকেই আজ তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিল এবং তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে বুঝিয়া, সকলেই আপন আপন কাজ ভুলিয়া তাহার কাছে বসিয়াছিল। মানুষ যখন পৃথিবী হইতে বিদায় লয়, তখন শত্রু মিত্র সকলেই তাহাকে দয়ার চক্ষে দেখিয়া থাকে। মাণিকের মার শত্রু কেহই ছিল না; তাহার প্রকৃতি অতিশয় নম্র এবং স্বভাব বড়ই নির্ম্মল ছিল। প্রতিবেশীরা সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। সুতরাং এ সময়ে তাহারা তাহার কাছে বসিয়া থাকিবে ইহা বিচিত্র নহে।

রামকিশোর প্রত্যহ দুই বেলাই মাণিকের মার সংবাদ লইতেন। মাণিকের মা তাঁহার সমক্ষে বাহির হয় না এবং কথা কহে না বলিয়া তিনি তাহার সম্মুখে আসিতেন না। মাণিকের মা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে দেখিতে চাহিতেছে শুনিয়া তিনি তাহার বাড়ীতে আসিলেন এবং উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রমণী কুটীরের দাওয়ায় এক ছিন্ন কন্থায় শুইয়াছিল, তাহার উত্থান শক্তি ছিল না। রামকিশোর আসিয়াছেন শুনিয়াই সে অতি কষ্টে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইল এবং কাতর বচনে কিন্তু অসঙ্কোচে কহিল,— "কর্ত্তা আমাকে একটু চরণ ধূলি দেন।" রামকিশোর কোন কথা কহিবার

পূর্ব্বেই রমণী পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"বাবা মাণিক, তুমি আমাকে কর্ত্তার চরণ ধূলি একটু আনিয়া দেও, উনিত আমাকে "ছুঁতে পার্‌বেন না।" মাণিক মায়ের আদেশে দুই হস্তে রামকিশোরের কাষ্ঠ পাদুকা স্পর্শ করিয়া সেই হাত মাতার কপালে বুলাইয়া দিল।

রমণীর লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রামকিশোরের সমক্ষেই সে অতি জোরে কথা বলিতে লাগিল। কহিল—"কেউ আমার গরুটা এখানে নিয়া আইস।"

একজন প্রতিবেশী গরুটা উঠানে আনিল। পশু বিনা বন্ধনেই সেখানে শান্তভাবে দাঁড়াইল এবং এক দৃষ্টিতে মৃত্যু শয্যায় শায়িতা পালিকার প্রতি চাহিয়া রহিল। রমণী তাহার দিকে আপনার দুর্ব্বল হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র গাভীটা লোক ঠেলিয়া একবারে দাওয়ার নীচে যাইয়া দাঁড়াইল এবং দরিদ্র বিধবার ছিন্ন কন্থার উপর মুখ বাড়াইয়া দিল। মাণিকের মা তাহার মস্তকে হাত দিল। পশু কথা কহিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার মুখ চক্ষু কান প্রভৃতি দ্বারা এমন ভাব দেখাইল যে, উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেরই চক্ষে জল আসিল।

রমণী এইবার রামকিশোরের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিল,— কর্ত্তা সংসারে আমার ছিল, মাণিক আর এই গরুটা; আমি গেলে এদের আর কেউ রহিল না। গরু অনেকেরই থাকে, কিন্তু ভগবান জানেন, আমি আমার মাণিককে যে যত্ন করেছি, এই গরুটাকেও তার চেয়ে কম করি নাই। মাণিককে ও মেনিকে আপনার হাতে দিয়া গেলাম, আপনার পালে কত গরু, সেই সঙ্গে আমার মেনি থাকিবে। খোকা বাবুকে ওর দুধ খাইতে দিবেন। আর মাণিক যদি বাঁচে, সেও খোকা বাবুর চাকর হইয়া থাকবে। যে রক্তে জন্ম, কখনও আপনাদের অনিষ্ট করবে না।"

রমণী আর কথা কহিতে পারিল না। বিবর্ণ চক্ষু-কোটর জলে পরিপূর্ণ হইল। বৃদ্ধ রামকিশোরের চক্ষু দিয়াও দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল। উপস্থিত প্রতিবেশিগণ সকলেই কাঁদিল।

এই দিন সন্ধ্যার পরই মাণিকের মা সংসারের সমস্ত জ্বালা হইতে মুক্তি লাভ করিল এবং এক মাত্র নিরাশ্রয় রুগ্ন পুত্রকে রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গেল।

৪

রামকিশোর মাণিকের মার অন্তিম সময়ের অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফটিক মণ্ডলকে তিনি ভালবাসিতেন। রমণী না বলিয়া গেলেও, হয় ত তিনি মাণিকের খবর লইতেন। কিন্তু মাণিকের মাতার মৃত্যুকালের প্রার্থনা তাঁহার মনে বিশেষ ভাবে অঙ্কিত হইয়া পড়িল। তিনি রুগ্ন বালকের চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও প্রতিপালনের ভারগ্রহণ করিলেন। মেনি গরুটীকে বাড়ীতে আনিলেন এবং বাড়ীর সকলকে কহিয়া দিলেন বালকটীকে ও গাভীটীকে যেন কোনও মতে অযত্ন করা না হয়।

সুচিকিৎসার গুণে মাণিক কিছুকাল পরেই আরোগ্য লাভ করিল। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় প্লীহা বড় মারাত্মক রোগ বলিয়া গণ্য ছিল না। জ্বরের পর প্লীহা দেখা দিলে, লোকে তখন আশ্বস্ত হইয়া বলিত,—'আর ভয় নাই, প্লীহা দেখা দিয়াছে।' এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ কাল প্লীহাই অনেক স্থলে সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

আরোগ্য লাভ করিবার পরে মাণিকের কাজ হইল দুইটী,—তার মেনিকে রাখা, আর মনিব ললিতকে দেখা। অবসর পাইলে সে আরও দুইটী কাজ করিত; এক লাঠি খেলা শিক্ষা, আর তালপাতে কলম বুলানো। রামকিশোরের বাড়ীতে বিশু সর্দ্দার নামে একজন সর্দ্দার

অর্থাৎ লাঠিয়াল ভৃত্য ছিল। সন্ধ্যার পরে সে বাহিরের উঠানে প্রায়ই একটু লাঠি খেলিত। বালক মাণিক প্রত্যহ নিবিষ্ট মনে তাহা লক্ষ্য করিত। কয়েক মাস দেখিতে দেখিতে তাহার লাঠি খেলা শিখিবার সখ হইল, সে একখানি ক্ষুদ্র লাঠি লইয়া অন্যের অসাক্ষাতে অনেক সময়ে সর্দ্দারের অনুকরণ করিত। একদিন বিশু ইহা দেখিতে পাইয়া তাহাকে খেলা শিখাইতে সম্মত হইল। কয়েক দিন শিখাইবার পর বিশু বুঝিতে পারিল, কালে এ বালক মানুষ হইবে।

মাণিকের একটু লেখা পড়া শিখিবার ইচ্ছাও বড়ই প্রবল ছিল। রাত্রিতে আহারান্তে সে বাড়ীর সরকার মহাশয়ের কাছে বসিত। সরকার মহাশয় চশমা চক্ষে দিয়া মাটীর প্রদীপ সম্মুখে রাখিয়া আপনার দপ্তর খুলিয়া কাজে বসিতেন। বালক তাঁহাকে বিরক্ত করিত। অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সরকার মহাশয় মধ্যে মধ্যে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। মাণিক তাঁহার কিঞ্চিৎ দূরে একটা কাঠের উপর বসিয়া তালপত্রে কলম ঘসিত।

মাণিকের লাঠি খেলা এবং লেখা পড়া শিক্ষার চেষ্টার কথা অল্প দিনেই চৌধুরী মহাশয়ের কানে উঠিল। তিনি বিশু এবং বাড়ীর সরকার উভয়কেই কহিয়া দিলেন, উহাকে যথাসাধ্য শিক্ষা দিও। ফলতঃ বাড়ীর কর্ত্তার তাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল বলিয়া, মাণিককে বাড়ীর কেহই অনাদর করিতে পারিত না। মাণিক প্রায়ই বাড়ীর বাহিরে থাকিত বটে, কিন্তু ক্রমশঃ আদর পাইয়া সে বাড়ীর ছেলের মতই হইয়া উঠিল। আহার করিতে যাইবার সময় চৌধুরী মহাশয় প্রায় প্রত্যহই জিজ্ঞাসা করিতেন,—"মাণিকের ভাত দেওয়া হইয়াছে ?" স্নান করিয়া আসিয়া মাণিককে অস্নাত দেখিলেই কহিতেন,—"মাণিক, তুই নাইতে গেলি না ?" বাড়ীতে কোন দিন পিষ্টক মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইলে, রামকিশোর

মাণিকের পাতা দেখিতেন, তাহার পাতায় সব রকম জিনিষ পড়িয়াছে কি না! শ্রাবণ মাসে বাড়ীতে দুপাঁচটী মহার্ঘ্য আম আসিলেও চৌধুরী মহাশয় সংবাদ লইতেন, মাণিক তাহার একচির পাইল কিনা।

পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালকের প্রাণ সামান্য আদরেই কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া যাইবার কথা। মাণিক, চৌধুরী মহাশয়কে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও সম্ভ্রম করিত। মাণিক মানুষ হইয়া উঠিতে না উঠিতেই বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয়ের দেহত্যাগ ঘটিল। মৃত্যুকালে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথার সঙ্গে তিনি পুত্র যাদবকিশোরকে মাণিকের কথাও কহিয়া গেলেন। বৃদ্ধের মুখ দিয়া যখন তাহার নাম বাহির হইল, ষোল বৎসরের বালক মাণিক তখন তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না, কিছু দূরে যাইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

৫

যাদবকিশোর পিতার ন্যায় দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর দশ বৎসর মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। এই দশ বৎসরেই তিনি মাণিকের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। মাণিককে তিনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। মাণিকও তাঁহাকে উপাস্য দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। যাদববাবু যেখানে যাইতেন, মাণিক তাঁহার সঙ্গে যাইত। এমন বিশ্বস্ত অনুচর অনেক সময়ে মানুষের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

মাণিক এখন একজন সর্দ্দার বলিয়া পরিচিত। লাঠির কৌশল তাহার অসাধারণ। চৌধুরী মহাশয়ের পুরাতন লাঠিয়াল বিশু সর্দ্দারের মৃত্যু হইয়াছে। মাণিকই এখন সর্দ্দারের কাজ করে। রাত্রিতে সে তাহার লাঠি লইয়া চৌধুরী মহাশয়ের সদর দরজায় শুইয়া থাকে এবং বাড়ীর রক্ষকের কাজ করে। সাহস তাহার অতিশয়। গায়ে বলও

প্রচুর। মাণিকের এক গুণ ছিল, নিকটস্থ দু'চারি গ্রামের কোথায় কি হইতেছে, সে সমস্ত সংবাদ রাখিত। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সে প্রায়ই বাহির হইত এবং রাত্রি একঘণ্টা দেড় ঘণ্টা অতীত হইতেই লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিত। কোন বাড়ীতে হরিরলুট থাকিলে মাণিক সেখানে যাইবেই যাইবে। সে নিজে বেশ হরির গান গাইতে পারিত। ক্রমে তাহার প্রতিপত্তি এত অধিক হইয়া উঠিল যে নিকটস্থ দু'চারি গ্রামের মধ্যে কোথাও হরিসংকীর্ত্তন হইলে, গৃহস্বামী মাণিককে পৃথকভাবে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং সে না আসিলে মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন।

মাণিকের বয়স যখন ২১ বৎসর, সেইবার ময়মনসিংহে ঠিক দুর্ভিক্ষ না হউক, লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে রীতিমত দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। মাণিক একদিন সন্ধ্যার সময় তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিল যে, সেই রাত্রিতে চৌধুরী বাড়ীতে ডাকাইতি হইবার আশঙ্কা আছে। সে কেবল যাদব বাবুকে এই কথা জানাইল। যাদব বাবু ভীরু প্রকৃতির লোক ছিলেন না। মাণিকের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন। মাণিক কহিল,—"আমিই একাকী দ্বার রক্ষা করিব। আপনি দু'এক জন লোক লইয়া ছাতের উপরে থাকিবেন।" যাদবকিশোর তাহার বল ও সাহসের বিষয় সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

আহারান্তে স্ত্রীলোকদিগকে অন্য এক বাড়ীতে রাখিয়া আসা হইল। মাণিক সিংহদ্বার উত্তমরূপে অর্গলবদ্ধ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া রহিল। দরজাটী খুবই মজবুত ছিল। সহজে ভগ্ন হইবার নহে। দুই কপাটে দুইটী নেত্রাকার ছিদ্র ছিল, মাণিক তাহারই মধ্য দিয়া দুইটী সড়্কী চালাইয়া বসিয়াছিল। যাদববাবু ছাতের উপরে কিছু ইষ্টক প্রস্তরাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য ডাকাইতদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না। মাণিকের কৌশল সম্পূর্ণরূপে সফল হইল। রাত্রি আড়াই প্রহরের সময়ে দস্যুগণ যেমন আসিয়া সিংহদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল, অমনই উপর হইতে তাহাদের পিঠে দুপ্ দাপ্ ইট পাথর পড়িতে লাগিল। মাণিকের সড়্কী দুইজন লোককে বিদ্ধ করিল। যাদববাবু ছাতের উপর এমনভাবে পাদ-চারণা করিতে লাগিলেন যে ডাকাইতেরা বুঝিল উপরে অনেক লোক আছে। তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। একজন প্রৌঢ়বয়স্ক লোক কহিল,—"আমি তখনই বলেছিলাম যে, মাণিক বিশের বাবা। এ বাড়ীতে ও থাকিতে কিছু করবার যো নাই।" আহত ব্যক্তিগুলিকে লইয়া দস্যুরা পলায়ন করিল।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন অপরাহ্নে যাদবকিশোর বহির্দ্দেশে গিয়াছেন। বাটীর বাহিরের প্রাচীর-সংলগ্ন একটী একদ্বার বিশিষ্ট ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি বসিয়াছিলেন। বাহিরে আসিবার সময়ে যেমন তিনি দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন অমনই দেখেন এক বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া প্রকোষ্ঠের দিকে ধাবিত হইতেছে। যাদব বাবুর ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। বাহির হইলেই তিনি সাপের মুখে পড়েন অথচ প্রকোষ্ঠেও তিষ্টিতে পারেন না। তিনি কপাট ধরিয়া এক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মাণিক কোথায় ছিল, চীৎকার শুনিয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া আসিল এবং কহিল,—"কর্ত্তা ভয় নাই, আমি আসিয়াছি।" মাণিক কিঞ্চিদ্দূর হইতে হাতে দুটী তুড়ি দিয়া মুখে এমন শীষ দিতে লাগিল যে, সাপটী তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে ফিরিল। মাণিক তীব্রবেগে ছুটিল। সর্প তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল, যাদবকিশোর বাহিরে আসিলেন। মাণিক কিছুকাল পরেই একটী নিরাপদ স্থানে পঁহুছিল, এবং অন্য লোকের সাহায্যে সর্পটীকে মারিয়া ফেলিল। যাদবকিশোর সেই দিন হইতে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই বলিতেন,—"মাণিক আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছে।"

ইহার কয়েক বৎসর পরেই নাবালক পুত্র ললিতকিশোরকে রাখিয়া যাদবকিশোর পরলোক গমন করিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে পুত্রকে কহিয়া গেলেন,—"মাণিক রহিল, ঐ তোমাকে দেখিবে। সংসারে মাণিকের ন্যায় বন্ধু তোমার আর নাই।"

৬

মাণিক বস্তুতই ললিতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিল। যাদবকিশোরের শ্রাদ্ধাদির আয়োজন সমস্তই মাণিকের পরামর্শমত হইল। ললিতকিশোরকে মাণিকই হাতে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। ইহাতে তাহার প্রতি ললিতের যে স্বাভাবিক ভালবাসা জন্মিয়াছিল, পিতার আদেশে তাহা যেন আরও বর্দ্ধিত হইল। মাণিকের অভিপ্রায় না লইয়া ললিতকিশোর কোন কর্ম্মই করিতেন না। মাণিককে তিনি কোন দিনও ভৃত্য বলিয়া ভাবেন নাই, প্রত্যুত অগ্রজের ন্যায় তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর ললিতকিশোর তামাকু সেবন করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু মাণিকের সম্মুখে তিনি কখনও হুঁকা ধরিতেন না।

ললিতের বিবাহ একপ্রকার মাণিকই দিয়াছে। সেই সর্ব্বাংশে বরকর্ত্তার ন্যায় হইয়া বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছে, নিজে কন্যা দেখিয়াছে এবং বুনিয়াদী ঘরের কন্যার মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুলক্ষণা মনে করিয়াছে, তাহারই সহিত ললিতের বিবাহ দিয়াছে। দু'একজন ঘটক 'বামুনের বিবাহে চাঁড়াল কর্ত্তা' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই।

ললিতের সন্তান হইয়াছে। মাণিকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি আসিয়াছে। ১৩০৪ সাল, জ্যৈষ্ঠ মাস। এই মাসের প্রথমে ললিতের দক্ষিণ পদে একটি ব্রণ হয়। ব্রণটি সামান্য নহে, মাংসের নীচে হাড়ের উপরে হইয়াছিল। গ্রাম্য ডাক্তার কবিরাজ প্রথমতঃ রোগ নির্ণয়

করিতে পারে নাই। চর্ম্মের উপরে স্ফীতি দেখিয়া তাহারা গাছগাছড়ার প্রলেপ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহাতে কিছুই ফল হয় নাই। আভ্যন্তরিক বেদনা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। ললিত শয্যাশায়ী হইলেন। মাণিক চিন্তিত হইয়া ময়মনসিংহ হইতে সাহেব ডাক্তার আনাইল। সাহেব ২৭এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রাতঃকালে ললিতকে অজ্ঞান করিয়া তাহার পায়ে অস্ত্র করিলেন। কহিলেন—"আর দুই একদিন বিলম্ব হইলে রোগীকে রক্ষা করা কঠিন হইত। ইনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।" গ্রাম্য ডাক্তারকে ঘা শুকাইবার উপকরণাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সাহেব পরদিন প্রভাতে ময়মনসিংহে ফিরিয়া গেলেন। কহিলেন,—"ঘা শুকাইতে দশ বার দিন লাগিতে পারে!"

ইহার দুই দিন পরে, ১৩০৪ সালের, ৩০এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার; পাঠক পাঠিকার সে ভীষণ দিন স্মরণ আছে কি? সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প যাহাতে অর্দ্ধবঙ্গ রসাতলে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহা মনে পড়ে কি? লেখক স্বয়ং একজন ভুক্তভোগী। সে দিনের কথা তাঁহার স্মৃতি-পট হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না। তাহার বর্ণনা করিতে এখনও যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে ৩০এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ বেলা পাঁচটার পর চলৎশক্তিবিহীন ললিতকিশোর তাঁহার বৈঠকখানার পার্শ্বে একটী ঘরে একখানি পালঙ্কোপরি নিদ্রিত। তাঁহার একটু নিদ্রা আসিয়াছে দেখিয়া ভৃত্যেরা নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের কেহ আলোতে তেল ঢালিতেছে, কেহ বা নিকটস্থ দীর্ঘিকায় জল আনিতে গিয়াছে। ললিতের নিকটে কেহই নাই। মাণিক বৈঠকখানার সম্মুখে বাহিরে বসিয়া তামাকু খাইতে ছিল, আর ললিত কতদিনে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিবেন তাহাই ভাবিতেছিল। সহসা পদতলস্থ মৃত্তিকা কাঁপিয়া উঠিল। মাণিক

প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিল না। পুনরায় কম্পন আরম্ভ হইল। মাণিক এক দৌড়ে ললিতের গৃহে প্রবেশ করিল, তখন তিনি পালঙ্ক হইতে অবতরণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। ভূমিকম্পের বেগও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ললিতকিশোর কেবল কহিলেন, "মাণিক দাদা আমার জন্য তোমার প্রাণটা দিও না, আমি গিয়াছি।" মাণিক কোন কথা না বলিয়া তাঁহাকে কোলের মধ্যে উঠাইয়া লইল, এবং দক্ষিণ পদের বেদনার স্থানে না লাগে এই ভাবে তাহাকে অতি সাবধানে আঁকড়াইয়া ধরিল। বানরী কিংবা বিড়ালী যেমন ছানা বুকে করিয়া এক স্থান হইতে অন্যত্র যায়, মাণিক সেই ভাবে দৌড়াইল। বৈঠকখানার হল পার হইয়া ক্ষুদ্র দালান, তাহার পরেই প্রাঙ্গণ। মাণিক নির্ব্বিঘ্নে হল পার হইয়াছিল, কিন্তু দালানটীর মধ্যে আসিলেই একটী বরগা ছুটিয়া বিষম জোরে তাহার পৃষ্ঠের উপর পড়িল, মাণিক সে আঘাত গ্রাহ্যই করিল না। দেখিতে দেখিতে অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইল। ললিতকে নিরাপদ স্থানে নামাইয়া সে আপন পিঠে হাত দিল, এবং বুঝিতে পারিল আঘাত সামান্য নহে।

৭

মাণিকের আঘাত গুরুতর হইয়াছে ইহা ললিতকিশোর অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন। তাহার চিকিৎসার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। টেলিগ্রাফ করিয়া ময়মনসিংহ হইতে ডাক্তার সাহেবকে আনিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন,—"সাহেব, যদি আপনি আমার মাণিক দাদাকে বাঁচাইতে পারেন, তবে আপনি যত টাকা চান আমি তাহাই দিব!" সাহেব মাণিককে পরীক্ষা করিয়া বড় ভরসা দিলেন না। ললিত তাঁহার মুখ দেখিয়াই বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন,—"মাণিক দাদা, তুমি যদি না বাঁচ, তাহা হইলে জগতে আর কেহ যেন পরের উপকার না করে।"

মাণিকের জীবনের ব্রত শেষ হইয়াছে। ললিতের প্রার্থনা তাহাকে

পৃথিবীতে রাখিতে পারিল না। ললিত ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিলেন, এদিকে মাণিকের অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইতে লাগিল। আষাঢ় মাসের ১২ই তারিখে মাণিকের আত্মা নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করিল। ললিত তখন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে মাণিক কহিল,—"দাদা বাবু, তোমাকে যে সুস্থ দেখিয়া গেলাম, ইহাতেই আমার সুখ।" ললিত শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। জগতে আজ আমি সহায়হীন, বন্ধুহীন, অভিভাবকহীন হইলাম বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পিতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন—"বাবা, তুমি আমায় মাণিক দাদার হাতে দিয়ে গিয়াছিলে। মাণিকদাদা আমাকে যমের হাত থেকে উদ্ধার করে আজ নিজে চলে যায়।"

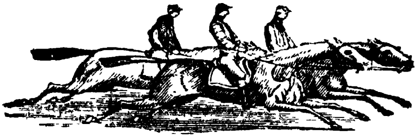
ললিতকিশোর মাণিকের ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া অতিশয় যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিলেন এবং নিরূপিত দিনে প্রচুর ব্যয় করিয়া মাণিকের শ্রাদ্ধ করাইলেন। কিছুদিন পরে তিনি মাণিকের শ্মশানে একটি সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার গাত্রে একখানি প্রস্তর বসাইয়া দিলেন, এবং সেই প্রস্তরে এই কথাগুলি খোদিত করাইয়া রাখিলেন।—

জন্ম নিয়া সমাজের নিম্নস্তরে তুমি
কর্ম্মগুণে পবিত্র করিলে মর্ত্ত্যভূমি।
মাণিক মানবকুলে মাণিক সমান
পরেরে বাঁচা'তে নিজে হারা'লে পরাণ।
যতদিন মোর বংশে রবে বংশধর
প্রণমিবে সবে এই সমাধি প্রস্তর।
যাবৎ জ্বলিবে দীপ চৌধুরী-বাড়ীতে
সন্ধ্যার আঁধারে আলো দিবে সমাধিতে।

বর্ষে বর্ষে এ শ্মশানে করিবে উৎসব
খা(ও)য়াইবে দীন দুঃখী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব।
কিছুমাত্র বিত্ত বংশে রবে যত দিন
অযত্নে প্রস্তর যেন না হয় মলিন।
বহিবে আমার রক্ত যার ধমনীতে
রহিবে তাহার ভক্তি এই সমাধিতে।

শ্রীললিতকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী।

আমাদের বিশ্বাস ললিতকিশোরের বংশধরগণ অবশ্য এ আদেশ পালন করিবেন।



রামকমল রায়।

১২৫৯ সালের আষাঢ় মাস। বাঙ্গালায় চাষার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, কাহারও ঘরে অন্ন নাই। আষাঢ় মাস কোন বৎসরই চাষার পক্ষে সুখের মাস নহে। এই সময়ে দরিদ্র কৃষক গৃহের সঞ্চিত শস্যের শেষ মুষ্টি পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে বপন করিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া থাকে; এবং নিজে ঘরে বসিয়া খায়, বা সময়ে সময়ে উপবাসী রহে। এবার অতিশয় দুর্ব্বৎসর। পূর্ব্ববৎসর অজন্মা গিয়াছে বলিয়া কৃষকের অবস্থা ভাল ছিল না, কষ্টে তাহাদের দিন যাইতেছিল। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ে অধিকাংশ লোককেই একেবারে নিরাশ্রয় ও নিরন্ন করিয়া তুলিয়াছে।* অনেকেরই ঘর বাড়ী গিয়াছে; কেহ পাতার কুঁড়ে, কেহ বা গাছের তলা আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু আশ্রয়স্থান অপেক্ষা মানুষের আহারের প্রয়োজন অধিক। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি বঙ্গীয় কৃষক ক্ষুধার জ্বালায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে হা অন্ন হা অন্ন রব উঠিয়াছে। কাহারও অর্দ্ধাসনে কাহারও বা অনশনে দিন কাটিতেছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য

* ১২৫৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ ঝটিকা বাঙ্গালার এক স্মরণীয় দুর্ঘটনা।

অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। দরিদ্রের গৃহে কিছুমাত্র অর্থ নাই। মহাজনগণ সময় বুঝিয়া সুদের হার বাড়াইয়াছে। যাহাদের কিছু জমী জমা আছে, তাহারা তাহাই বন্ধক দিয়া ঋণ পাইতেছে। অন্যে তাহাও পাইতেছে না। খাটিয়া খাইতে অনেকে প্রস্তুত, কিন্তু খাটাইবার লোক অধিক নাই। নিরন্ন লোকদিগের মধ্যে কেহ দিনান্তে একটি কুষ্মাণ্ড, কেহ দুটি কাঁচকলা, এবং অভাবে কেহ কেহ কচুর শাক, ওলের ডাঁটা ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। যাহার দশ মুষ্টি তণ্ডুলের প্রয়োজন, সে হয় ত অতি-কষ্টে দুই মুষ্টি সংগ্রহ করিয়া তাহা শিশুসন্তানগুলিকে খাওয়াইয়া নিজে উপবাসী রহিতেছে। কেহ বা অল্পপরিমাণ তণ্ডুলের সহিত অধিক পরিমাণ শাকের ডাঁটা কাঁঠালের বিচি ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া, পরিবারস্থ সকলকেই সেই মিশ্রিত খাদ্যের এক এক মুষ্টি দিতেছে। যাহার কিছুই যুটিতেছে না, সে বিধাতার প্রদত্ত বিনামূল্যের সামগ্রী জলপান ও বায়ু সেবন করিয়াই দু' এক দিন কাটাইয়া দিতেছে।

এই সময়ে দু' এক জন দানশীল লোক দুঃখী দরিদ্রকে দুটি অন্ন দিবার ব্যবস্থা করিয়া আপন আপন অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন। খরস্রোতা নদীর তীরবর্ত্তী গোপীনাথপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামের একটি বাড়ীতে প্রতি-দিন দুই তিন শত লোক আহার পাইতেছিল। এই বাড়ীটি রামকমল রায়ের। রামকমল ব্রাহ্মণ। তাঁহার বাড়ী "রায়ঠাকুরের বাড়ী" বলিয়া পরিচিত। গ্রামের মধ্যে রায়ঠাকুরেরাই একমাত্র সমৃদ্ধ লোক। রায়-ঠাকুরদের জমা জমি ও নগদ টাকা—দুইই আছে। রামকমল ব্যবস্থা করিয়াছেন, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের গরীব দুঃখী যে আসিবে, সেই পেট পুরিয়া দুটি ভাত খাইতে পাইবে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন নির্দ্দিষ্টপরিমাণে কিছু তণ্ডুল বিতরিত হইবে। কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিতেও যে আসিবে, সেই পাইবে। কোন দিন কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে পর দিন তাহা বিতরিত হইবে।

মাসের যত দিন যাইতেছে, রামকমলের বাড়ীতে সমাগত লোকের সংখ্যা ততই বাড়িতেছে। আজ ২৪এ আষাঢ়, রামকমল বাড়ীতে নাই। তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র অন্ন ও তণ্ডুল বিতরণ করিতেছেন। দুই তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকেরাও আসিয়াছে, এবং সকলেই সফলমনোরথ হইয়া ফিরিতেছে। অনেকেই অন্ন না চাহিয়া চাউল প্রার্থনা করিতেছে। খরস্রোতার অপর পারের এক অনাথা বিধবা আপনার শিশুপুত্র ক্রোড়ে লইয়া কিছু তণ্ডুল ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। রমণী ধীবরজাতীয়া। কয়েক মাস হইল, সে পতিহারা হইয়াছে। গৃহে বৃদ্ধা শাশুড়ী আর এই দুই বৎসরের শিশু সন্তান ভিন্ন অন্য কেহ নাই। রমণীর অতিকষ্টে দিন যাইতেছে। রায়ঠাকুরদের বাড়ীতে চাউল বিতরিত হয় শুনিয়া, সে আজ প্রথম গোপীনাথপুরে আসিয়াছে। আসিবার সময়ে সে তাহার গ্রামের দুই চারিটি লোকের সঙ্গে আসিয়াছিল। চাউল লইয়া ফিরিবার সময়ে তাহাদের সঙ্গ ধরিতে পারে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রমণীর বাড়ী খরস্রোতার অপর পারে। খরস্রোতা গোপীনাথপুরের দক্ষিণ দিক দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিতা। যে খেয়া-ঘাটে পার হইয়া এই রমণীর বাসগ্রামে যাইতে হয়, ঐ ঘাট রায়ঠাকুরদের বাড়ী হইতে পূর্ব্বদিকে ক্রোশাধিক দূরে। রমণী রায়ঠাকুরের বাড়ী হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গ্রামের লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল। কিন্তু সহসা আকাশে মেঘ হওয়ায় বৃষ্টি আসিবার ভয়ে লোকগুলি যখন দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঘাটের দিকে ছুটিল, তখন রমণী তাহাদের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। একে স্ত্রীলোক, তাহাতে সন্তানটি ক্রোড়ে, সঙ্গে সঙ্গে চাউলের ভারও কিঞ্চিৎ রহিয়াছে। সে কেমন করিয়া পুরুষের ন্যায় দৌড়াইবে?

অনাথা ধীবর-বিধবা যখন খেয়া-ঘাটে আসিয়া পঁহুছিল, তখন সে আর তাহার গ্রামের লোকগুলিকে দেখিতে পাইল না। তাহারা পার

হইয়া চলিয়া গিয়াছে। পারের নৌকাখানি নদীর অপর পারে বাঁধা রহিয়াছে। রমণীর বুক শুকাইয়া গেল। সে দেখিল, মেঘ ক্রমশই গাঢ় হইয়া আসিতেছে, এখনই বৃষ্টি আসিবে। ঘাটের নিকটে কোনও লোকালয় নাই। নদীর এ পারে কিংবা ওপারে একটিও লোক দৃষ্ট হইতেছে না। স্ত্রীলোকটি গত্যন্তর না দেখিয়া ঘাটের উপরে নদীতটে যে একটি বটবৃক্ষ ছিল, তাহার নীচে যাইয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রমণীর অঙ্গে যে সামান্য বস্ত্র ছিল, তাহার অঞ্চলের কতক অংশে রায়বাড়ীর চাউল ক'টি বাঁধা রহিয়াছে। অঞ্চলের অপরাংশ দিয়া সে ক্রোড়স্থ শিশুর মস্তকটি আবৃত করিল, এবং নিজে অনাবৃত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই বৃক্ষপত্রের সঞ্চিত বারি রমণীর মস্তকে বর্ষিত হইতে লাগিল। রমণীর নিজের শরীরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই; তাহার চেষ্টা যাহাতে তাহার পুত্রটি ও চাউল কটি না ভিজে। কিন্তু সামান্য বস্ত্র এ অবস্থায় আর কতক্ষণ শুষ্ক থাকিবে! ক্রমে সমস্ত বস্ত্র আর্দ্র হইয়া আসিল; শিশুর শরীর ভিজিয়া গেল! অনাথা জননীর কোলে থাকিয়া সে শীতে কাঁপিতে লাগিল।

রমণী উপায়ান্তর না দেখিয়া আপনার অঞ্চলবস্ত্রের খানিকটা নিঙ্গড়াইয়া লইল, এবং তদ্দ্বারা শিশুর গাত্রমার্জ্জনা করিয়া তাহাকে বক্ষে স্থাপিত করিল। নিজে ন্যুব্জভাবে রহিয়া পর্জ্জন্যদেবকে আপনার মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ পাতিয়া দিল।

কিন্তু এ অবস্থায় সে সুস্থ থাকিতে পারিবে কেন? রমণী পুনঃ পুনঃ চারি দিকে চাহিতে লাগিল; কিন্তু কোনও দিকেই আশার কিছু দেখিতে পাইল না। নদীর অপর পারে বাঁধা কাষ্ঠতরণী যেন নির্ম্মমপাষাণরূপে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। অঙ্গে বৃষ্টিবারিপতনে যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই

খরস্রোতা আপনার প্রবল স্রোতকে অধিকতর প্রবল করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিতেছে। জনমানবের চিহ্ন কোন দিকেই নাই। একটি ক্ষুদ্র খাল এই খেয়া-ঘাটের পূর্ব্ব দিক দিয়া উত্তর দিক হইতে খরস্রোতাতে আসিয়া পড়িতেছে। রমণী দুই একবার সে দিকেও দৃষ্টিপাত করিতেছে। মনে মনে ভাবিতেছে, যদি এই খাল দিয়া একখানি নৌকা আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহার চক্ষু যত দূর যায়, তত দূর কিছুই দেখা যাইতেছে না। সে চিন্তা করিতে করিতে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। শেষে ভাবিল, ফিরিয়া গোপীনাথপুরে যাই। রমণী পুত্রটি কোলে লইয়া উঠিল।

২

দুঃখিনী বিধবা বৃক্ষের তলা ছাড়িয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিল। অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক না গেলে আর লোকালয় মিলিবে না। সে দুই চারি পদ অগ্রসর হয়, আর এক একবার পশ্চাতে, দক্ষিণে ও উত্তর দিকে ফিরিয়া চাহে। দুই চারিবার এইরূপ চাহিবার পরে সে দেখিতে পাইল যে, পূর্ব্বোক্ত খালের মধ্যে উত্তর দিকে বহু দূরে একখানি নৌকা দক্ষিণ-মুখে আসিতেছে। ধীবরকন্যা ফিরিল, এবং পুনর্ব্বার বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে আশা এই যে, নৌকার লোকগুলিকে বলিলে, তাহারা দয়া করিয়া তাহাকে খরস্রোতা পার করিয়া দিতে পারে। রমণী একবার ভাবিল, যদি তাহারা খরস্রোতার অপর পারে না যায়, যদি তাহারা তাহার প্রার্থনা নাই শুনে। সে মনে মনে উত্তর করিল, নৌকাটা আসা অবধি এখানে থাকি, শেষে গোপীনাথপুর গেলেই চলিবে।

অল্পকালমধ্যেই নৌকাখানি খরস্রোতায় আসিয়া পড়িল, এবং মাঝিরা নৌকা থামাইয়া গুণ বাঁধিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। রমণী বুঝিল, এ নৌকা খরস্রোতা উজাইয়া পশ্চিম দিকে যাইবে; ও পারে যাইবে না। তাহার আশা প্রায় নির্ম্মূল হইল। সে তথাপি সাহসে ভর করিয়া দু’

এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া নৌকার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অবস্থা ও গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, মাঝিদের মধ্যে একটি যুবক বিদ্রূপ করিয়া কহিল,—"এস, নৌকা তোমার জন্যই এনেছি।"

রমণীর মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইল। সে কেবল পশ্চাতে ফিরিয়া পুনরায় বৃক্ষতলের দিকে যাইবে বলিয়া এক পা বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে নৌকার আরোহী এক জন ভদ্রলোক বিদ্রূপকারী মাঝিকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—"তুই ত ভারী দুষ্ট, জিজ্ঞেস কর্, ও কোথায় যাবে।"

মাঝি অপ্রস্তুত হইয়া স্ত্রীলোকটিকে একটু রুক্ষভাবে প্রশ্ন করিল,—"তুমি যাবে কোথা ?"

রমণী নৌকারোহী ভদ্রলোকটির স্বরে ও ব্যবহারে আশ্বস্ত না হইলে হয় ত এ প্রশ্নের উত্তরই দিত না। সে মুখ ফিরাইয়া অতি মৃদু ও কাতর স্বরে কহিল,—"আমি ও পারে যাব।"

নৌকারোহী ব্যক্তি মাঝিকে কহিলেন,—"ওকে নৌকায় তোল্।"

নৌকার বৃদ্ধ কর্ণধার এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই। সে বলিল,—"কর্ত্তা, এখন ওপারে যেতে গেলে ঠিক ছ' দণ্ডের ফের। যে স্রোত পড়েছে নদীতে, একবার পাড়ি দিয়ে ফিরে আস্তে গেলে বাড়ী যেতে যেতে সন্ধ্যা হবে।"

"তা হয় হবে, তোরা ত একবার খেয়েছিস, আমারই খাওয়া হয় নাই, ওকে দে পার ক'রে। এ দুর্দ্দিনে খেয়া নৌকা আর এ পারে নাও আস্তে পারে" আরোহী এই বলিয়া উত্তর করিলেন।

মাঝিরা আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্ত্রীলোকটিকে নৌকায় তুলিল, এবং পরপার অভিমুখে চলিল। অনাথা বিধবা নীরবে এক বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া কৃপালু-ভদ্রলোকটির প্রতি প্রাণের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাইল, এবং নৌকার কাঠে মস্তকস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

বৃষ্টি তখনও থামে নাই, কিন্তু বেগ কমিয়া আসিয়াছে। রমণী আর্দ্রবস্ত্রে নৌকার সম্মুখভাগে অনাবৃত অংশে বসিয়া আছে। পুনঃপুনঃ নিঙ্‌ড়াইয়া সে অঞ্চলাংশটি কতকটা শুষ্ক রাখিয়াছে। কিন্তু আপনার লজ্জা নিবারণার্থ মস্তকে অবগুণ্ঠন ও শিশুসন্তানটির শরীরে বৃষ্টিপতনবারণার্থ তাহার অঙ্গে আবরণ দিতে রমণীর ক্ষুদ্র অঞ্চলে কুলাইতেছে না। সে একবার শিশুর গাত্র হইতে কিঞ্চিৎ বস্ত্র টানিয়া লইয়া নিজের মস্তকে দিতেছে, আবার মস্তক হইতে কিঞ্চিৎ বস্ত্র সরাইয়া পুত্রের গাত্র আবৃত করিতেছে। সহৃদয় ভদ্রলোকটির প্রাণে এ দৃশ্য সহ্য হইল না। তিনি একখানি বস্ত্র বাহির করিয়া রমণীর নিকট নিক্ষেপ করিলেন, এবং কহি-লেন,—"আমি তোমার ছেলেকে এই কাপড়খানি দিলাম।"

অনাথা বিধবার প্রাণ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। সে যেন আপনার অজ্ঞাতসারেই অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে স্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সে ক্রন্দন মর্ম্মস্থল-নিঃসৃত কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক। নৌকার মধ্যে বসিয়া আরোহী ভদ্র-লোকটিও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। জগদ্বিখ্যাত ভাবুক কবি ওয়া-র্ডস্‌ওয়ার্থ কহিয়াছেন,—"মানুষের অত্যাচার নৃশংস ব্যবহার প্রভৃতি অপেক্ষা তাহার কৃতজ্ঞতাই অনেক অধিক সময়ে মানুষকে কাঁদাইয়া থাকে।"

অশিক্ষিতা রমণীর প্রাণের বেগ থামিলেই সে কেবল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ইনি কে? গাছের তলায় দাঁড়াইয়া বারবার পরমেশ্বরকে ডাকিয়াছিলাম। ইনি কি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন? ইনি মানুষ না দেবতা? মানুষের কি এত দয়া? সে একবার মনে করিতেছিল, একজন মাঝিকে জিজ্ঞাসা করি, ইনি কে। কিন্তু লজ্জা তাহাকে কথা কহিতে দিল না।

যখন নৌকা নদীর অপর পারে আসিল, তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। রমণী নৌকারোহীকে প্রণাম করিয়া নৌকা হইতে নামিল। নূতন বস্ত্র-

খানির একাংশে তণ্ডুলগুলি বাঁধিল, এবং অপরাংশ বালকের গাত্রে দিয়া তাহাকে কোলে লইয়া বাড়ীমুখে চলিল। নৌকাখানি যত দূর পর্য্যন্ত দেখা গেল, সে এক একবার তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল, এবং এক এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। বাড়ী পঁহুছিলে বৃদ্ধা শাশুড়ী তাহার মুখে নৌকারোহীর দয়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। বালকটি পিতামহীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—"স্থাখ ঠাকুমা, আমাকে ক্যামন কাপল দিয়েছে।"

এই নৌকারোহী ভদ্রলোকটির পরিচয় পাইবার নিমিত্ত পাঠকের কৌতূহল জন্মিয়া থাকিতে পারে। ইনিই সেই রায়ঠাকুরদের বাড়ীর কর্ত্তা রামকমল রায়। রমণী যাঁহার বাড়ীতে তণ্ডুল লইয়াছিল, তাঁহার হস্ত হইতেই এই বস্ত্র পাইল। রামকমল সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাড়ী পঁহু-ছিলেন। তখনও তাঁহার স্নানাহ্নিক হয় নাই।

৩

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রামকমলের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার বাড়ীতে তণ্ডুল বিতরণ করিতেছিলেন। রামকমলের সংসার এই দুই ভ্রাতুষ্পুত্র লইয়া; অথবা তাহাদেরই সংসার, রামকমল তাহার অনাসক্ত কর্ত্তা মাত্র। ইঁহারা রামকমলের জ্যেষ্ঠ সহোদর নীলকমল রায়ের সন্তান। নীলকমল ও রামকমলের পিতা মাতা অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। নীলকমলও দীর্ঘজীবী হন নাই। তিনি অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়সে দুইটি শিশু পুত্র রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। এখন সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কানাইলালের বয়স চব্বিশ পঁচিশ বৎসর, আর কনিষ্ঠ কিশোরীলালের বিশ একুশ বৎসর হইবে।

রামকমল বিবাহ করেন নাই। যখন নীলকমলের কাল হয়, তখন রামকমলের বিবাহের বয়স হইয়াছে। দুই এক স্থান হইতে তাঁহার

বিবাহের সম্বন্ধ প্রস্তাব লইয়া ঘটক আসিতেছে, এমন সময়ে নীলকমল কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন, সেই পীড়াই তাঁহার শেষ পীড়া। রামকমল অগ্রজ-গত-প্রাণ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তিনি যে কেবল শোকে কাতর হইলেন, তাহা নহে, সংসারের সমগ্র দায়িত্ব তাঁহার নিজের স্কন্ধে' পড়িল বলিয়া, তিনি বিশেষ চিন্তিত হন। অগ্রজের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর অনেকে রামকমলের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকিবেন বলিয়া ঘটকমাত্রকেই প্রত্যাখ্যান করেন। দুই এক জন আত্মীয় কুটুম্ব তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলেন যে, হিন্দুর পক্ষে সংসারে থাকিয়া এরূপ প্রতিজ্ঞা করা সঙ্গত নহে, আর ইহা পালন করাও অতি কঠিন। রামকমল তাঁহাদের মধ্যে একজন বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়কে তাঁহার মনের ভাব জানাইয়া দেন। তিনি বলেন,--"আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হই। আর যে বংশে জন্মিয়াছি, সেই বংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি। পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ই ত আমার পুত্রস্থানীয়। আমি দারপরিগ্রহ করিলে যদি আমার সন্তান হয়, তাহা হইলে উহাদের প্রতি আমার স্নেহের হ্রাস হইতে পারে, এই কথা ভাবিতেও আমার মনে কষ্ট হয়। গুরুজনদিগের আশীর্ব্বাদে আমি যেন উহাদিগকে পালন করিতে ও সুশিক্ষা দিতে পারি। আর কোনরূপ কুকার্য্য করিয়া পবিত্র পিতৃকুল কলঙ্কিত না করি।" ইহার পরে আর কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করে নাই।

রামকমল তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালনে সমর্থ হইয়াছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছেন, এবং রীতিমত সুশিক্ষা দিয়াছেন। সে শিক্ষা অবশ্য বিশ্ববিত্থালয়ের শিক্ষা নহে। তখনকার দিনে পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণসন্তানের যে শিক্ষা ছিল, কানাই ও কিশরীলাল সেই শিক্ষা

পাইয়াছেন। রামকমলের নিজের বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই বয়সেই তিনি আপনার আচরণ ও চরিত্রের গুণে অনেকের নিকট বৃদ্ধের ন্যায় সম্মানিত। তিনি শিশুর ন্যায় সরল, বীরের ন্যায় নির্ভীক ও যোগীর ন্যায় জিতেন্দ্রিয়। পনের বিশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি নিকটস্থ বহু গ্রামে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছে।

বস্তুতঃ মানুষের সৎকার্য্য অসৎকার্য্য সুখ্যাতি অখ্যাতি জীবনের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে না। এক এক জন লোক অল্পকালমাত্র সংসারে থাকিয়া যে সুনাম বা দুর্নাম রাখিয়া যান, অনেকে দীর্ঘজীবন যাপন করিয়াও তাহা পারেন না। বলা বাহুল্য, সংসারের উপকারী সৎকার্য্যময় পুণ্য জীবন অল্পকালস্থায়ী হইলেও তাহা গুণহীন দীর্ঘজীবন অপেক্ষা অনেক অধিক শ্লাঘ্য ও মূল্যবান। জগতের অনিষ্টকারী মনুষ্যনামের অযোগ্য পাপীর জীবনের কথায় আর প্রয়োজন কি?

অনাথা ধীবররমণী যে রামকমলকে দেবতা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল, আমরা তাহাতে তাহাকে দোষ দিতে পারি না। মনুষ্যে দেবত্ব অধিক থাকিলেই লোকে তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে সম্ভ্রম করে। রামকমলের দেবগুণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা রামকমলের বংশমর্য্যাদার কথা বলিয়াছি। রামকমল এই বংশের এক অতি উজ্জ্বল রত্ন হইলেও, তাঁহার জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই গোপীনাথপুরের রায়-পরিবার সৎকর্ম্মান্বিত সুব্রাহ্মণ-বংশ বলিয়া বিখ্যাত। রামকমলের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন এক প্রাচীন ধনবান ভূস্বামি-বংশের দীক্ষাগুরু ছিলেন। তাহাতেই তাঁহাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল। অনেক ব্রহ্মত্র জমি ছিল। এখন জমি তত অধিক না থাকিলেও নগদ টাকা অনেক বাড়িয়াছে। দেবসেবা, অতিথিসৎকার, পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতিতে রীতিমত ব্যয় করিয়াও বার্ষিক আয়ের অর্থ প্রায়ই কিছু উদ্বৃত্ত থাকে।

নিকটস্থ পঁচিশ ত্রিশখানি গ্রামের কেহ যাইয়া অভাব জানাইলেই, রামকমল তাহাকে টাকা ধার দিয়া থাকেন। তাঁহার পিতামহের সময় হইতেই এইরূপ টাকা ধার দেওয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে খত-পত্র তমশুকাদির প্রয়োজন হয় না। রামকমল একখানি খাতায় অধমর্ণদিগের নাম লিখিয়া রাখেন মাত্র। সমর্থ ব্যক্তিরা, অথবা যাহারা টাকা লইয়া কারবারে খাটায়, তাহারা কিছু কিছু সুদ দেয়; অসমর্থ ও দায়গ্রস্ত লোকে বিনা সুদেই টাকা পায়। বিপন্ন ব্যক্তিরা অবস্থানুসারে দান পাইয়া থাকে। দিনের বেলা অপেক্ষা রাত্রিতেই রামকমলের টাকা দেওয়া নেওয়া অধিক চলে। তাঁহার এক কথাই ছিল যে,—"সত্য গুড় আঁধারেও মিঠা লাগে।"

রামকমলের বাড়ীতে গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন। এই গোপীনাথ বিগ্রহের নাম হইতেই তাঁহাদের গ্রামের নাম গোপীনাথপুর। গোপীনাথের মন্দির বাড়ীর বাহিরে অবস্থিত। রামকমলের বাড়ীর অধিকাংশ ঘরই কাঁচা, বাড়ীর ভিতরে দুইটি ঘর, আর এই গোপীনাথের মন্দির ইষ্টক-নির্ম্মিত। গ্রামের হিন্দুগৃহস্থেরা প্রায় প্রত্যেকেই দিনান্তে একবার আসিয়া গোপীনাথকে প্রণাম করিয়া যায়। দিনে ও রাত্রিতে গোপীনাথের উদ্দেশে যে ভোগ উৎসর্গ করা হয়, অতিথি অভ্যাগত অল্পসংখ্যক হইলে তাহাই প্রসাদ পাইয়া থাকে।

রামকমলের শান্তিময় সংসারে তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া ও দুই ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্যেষ্ঠ কানাইলালের বিবাহ হইয়াছে, এবং তাহার এক পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। শিশুর বয়স দেড় বৎসর। কনিষ্ঠ কিশোরীলালের আজিও বিবাহ হয় নাই। আঠার বৎসর বয়সে তাহার কোষ্ঠিতে সংঘাতিক পীড়ার কথা লিখিত ছিল। কিশোরীলাল সে ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিয়াছেন। দুই এক স্থান হইতে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছে। রামকমল কন্যা দেখিবার জন্য এক স্থানে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময়ে

পথে সেই অনাথা ধীবররমণীকে যে ভাবে খরস্রোতা পার করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

৪

পরবর্ত্তী শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি কিশোরীলালের বিবাহ হইয়া গেল। রামকমল যে কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন, সেই কন্যাই তাঁহার মনোনীত হইল; এবং তাহারই সহিত তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিলেন। এই কন্যার পিতা একজন সমৃদ্ধ লোক। তিনি বরকন্যাকে আপনার অবস্থানুসারে বিলক্ষণ দান করিলেন; কিন্তু তজ্জন্য কোনরূপ ফর্দ্দ প্রস্তুত হয় নাই। বাঙ্গালায় তখন পুত্র-বিক্রয়-প্রথা ছিল না,—"বিবাহ-বিভ্রাট" বা "বলিদান" কেহ কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই। রামকমল ও কিশোরীলালের শ্বশুরের মধ্যে দেনা পাওনা লইয়া কোনরূপ বাক্যব্যয় হয় নাই। কিশোরীলালের শ্বশুরবাড়ী গোপীনাথপুর হইতে ষোল ক্রোশ দূরে। নৌকাপথে দূরত্ব আরও অধিক হইবে। বিবাহের পর দিন মধ্যাহ্নভোজনান্তে আট দশখানি নৌকাযোগে বরকন্যা ও বরযাত্রিগণ গোপীনাথপুর অভিমুখে রওনা হইলেন।

কিশোরীলালের শ্বশুরবাড়ী হইতে গোপীনাথপুরে আসিতে হইলে প্রথমতঃ একটি বড় নদী বাহিয়া অনেক দূর আসিতে হয়, তার পর একটি ছোট নদী দিয়া তিন চারি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেই একটি ক্ষুদ্র খাল পাওয়া যায়। এই খালই আসিয়া খরস্রোতায় পড়িয়াছে। খরস্রোতায় পড়িলে রায়ঠাকুরদের বাড়ী আর অধিক দূর নহে, ইহা পাঠক জানেন।

কিশোরীলালের বিবাহের নৌকাগুলি পূর্ব্বোক্ত বড় নদী ছাড়িয়া যখন ছোট নদীতে আসিয়া পড়িল, তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। এই নদী উজাইয়া আসিতে হইবে। বড় নদীর স্রোত ভাঁটি অথবা অনুকূল

ছিল। ছোট নদীতে আসিয়াই মাঝিরা গুণ ধরিয়াছে, এবং নৌকাগুলি ধীরে ধীরে আসিতেছে। বর্ষাকাল বলিয়া নদীতে স্রোত প্রবল ছিল, আর নদীর উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে জঙ্গল হইয়াছিল বলিয়া, গুণ টানিবার তেমন সুবিধা ছিল না। নদীটির পরিসর অধিক নহে। মধ্যে মধ্যে দু' একটি ছোট খাল আসিয়া নদীতে পড়িয়াছে। যেগুলিতে জল কম, মাঝিরা গুণ লইয়া তাহা পার হইয়া যাইতেছে। যে খালে জল অধিক, তাহা পার হইতে না পারিয়া গুণ গুটাইয়া নৌকায় আসিতেছে; এবং সুবিধা বুঝিয়া খালের অপর পারে বা নদীর অন্য তীরে যাইয়া পুনরায় গুণ ধরিতেছে।

অন্য নৌকাগুলি প্রায়ই বরের নৌকার পশ্চাতে রহিতেছে। বরের নৌকার মাঝিগুলি ভাল ও সংখ্যায়ও অধিক বলিয়া তাহারা গুণ টানিয়া অন্য নৌকাগুলি হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিল দেখিয়া কিশোরীলাল মাঝিদিগকে কহিলেন,—"অন্য নৌকাগুলি আসিতে দে; সব এক সঙ্গে যাবি।" মাঝিরা সম্মত হইল। এই সময়ে তাহাদের নৌকা একটি বড় খালের মুখে আসিয়া পঁহুছিল। গুণ তুলিতে হইল। মাঝিরা গুণ গুটাইয়া নৌকায় উঠিবে, এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড উপস্থিত।

খালের মধ্য হইতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় চড়িয়া আট দশ জন লোক সহসা বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া কিশোরীলালের নৌকা আক্রমণ করিল। যে কয়েকজন মাঝি গুণ ধরিয়া উপরে ছিল, তাহাদিগকে প্রহার করিয়া জলে নামাইল, এবং নৌকার উপরে উঠিয়াই কিশোরীলালকে অতি কর্কশস্বরে কহিল,—"যাহা কিছু আছে, সহজে দাও; নচেৎ ভাল হইবে না।"

কিশোরীলালের নৌকায় কেবল তাঁহার নবপরিণীতা বালিকা বধূ, আর তাহার পিত্রালয়ের এক বর্ষীয়সী দাসী ছিল। কিশোরীলাল দস্যুদিগের

ম্যাকৃতি দেখিয়া বুঝিলেন, এ অবস্থায় ইহাদিগকে বাধা দিবার উপায় নাই। বালিকা ভার্য্যাকে কহিলেন,—"তোমার গায়ে যে অলঙ্কারগুলি আছে, খুলিয়া দাও।"

দস্যুদিগের একজন কহিল,—"হাঁ, তাহা হইলে আর আমরা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে স্পর্শ করিব না। গহনাগুলি যা আছে—দাও, আর তোমার বরসজ্জার জিনিসগুলি বাহির কর; যা দামী থাকে, তাই নেবো। তা হ'লে আর কোনও অত্যাচার করিব না।"

মুহূর্ত্তমধ্যে দস্যুদিগের আদেশ প্রতিপালিত হইল। বৃদ্ধা দাসী চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে নববধূর গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া দিল। কেবল শাঁখা দু'গাছি হাতে রহিল। বালিকা ভয়ে দাসীর ক্রোড়ে মস্তক লুকাইল। দেখিতে দেখিতে দস্যুগণ তাহাদের ক্ষুদ্র ও ক্ষিপ্রগামী নৌকায় আরোহণ করিয়া সেই খাল দিয়া অনুকূল স্রোতে অন্তর্হিত হইল।

কিছুকাল পরেই অন্যান্য নৌকাগুলি কিশোরীলালের নৌকার পশ্চাতে আসিয়া লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বরযাত্রিগণ দস্যুতার বিবরণ শুনিল, এবং ক্ষণকালের জন্য সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। শেষে "কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ" ইত্যাদি রবে নৌকাগুলি ভরিয়া গেল। অনেকে বলিতে লাগিলেন,—"এবার যে বৎসর, তাহাতে চুরি ডাকাতি ত হ'বেই। বরের নৌকা এ ভাবে আগে আসিতে দেওয়াই ভাল হয় নাই। আমি বলিব বলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু বরের নৌকা পেছন থেকে ডাক্‌ব না ব'লে বলা হয় নাই।" কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—"এ নিশ্চয়ই সেই ভীমা বাগ্‌দীর দল। তাহার লোক না আছে কোথায়?" দু' এক জন বৃদ্ধ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কহিলেন,—"এখন সব নৌকাগুলি একত্র হইয়া আস্তে আস্তে চল। প্রত্যেক নৌকাতেই এক একটা বাতী জ্বালো, আর

বাদ্যকরেরা খুব জোরে বাজাইতে বাজাইতে চলুক। এখানে আর থাকা ঠিক নয়।" এই পরামর্শই স্থির হইল। নৌকাগুলি আবার চলিতে লাগিল। দস্যুদিগের পশ্চাদ্ধাবন মূর্খতা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইল।

রামকমল ইহার কিছুই জানেন না। তিনি ইহাদের সঙ্গে ছিলেন না। পূর্ব্ব রাত্রিতে বিবাহ শেষ হইয়া গেলে, তিনি একখানি ডিঙ্গি নৌকায় বাড়ী রওনা হইয়া গিয়াছিলেন, এবং সেখানে যাইয়া বরকন্যার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন!

৫

রামকমল অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিতেন। তাঁহার প্রাতঃকৃত্য খরস্রোতায় সম্পন্ন হইত। নদীতে অবগাহন করিয়া তিনি ঘাটে বসিয়া স্নানাহ্নিক সারিতেন। তখনও গোপীনাথপুরের অনেক লোক নিদ্রার ক্রোড়ে থাকিত। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রামকমল বাড়ীমুখে ফিরিতেন। তাঁহার পরিধান একখানি পট্টবস্ত্র, হস্তে এক ঝারি জল, তদুপরি প্রাতঃ-কালের পরিত্যক্ত ধৌত বস্ত্রখানি, গলদেশে শুভ্র উপবীত, মস্তকে বা স্কন্ধে গামছাখানি। পথে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, সেই তাঁহাকে প্রণাম বা অভিবাদন করিত। রামকমল প্রত্যেকের সহিত দু' একটি কথা কহিতেন। কথা কেবল তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে নহে। প্রতিবেশীদের মধ্যে যাহার সংবাদ যাহার রাখিবার কথা, রামকমল তাহাকে সেই প্রতিবেশীর কথাও জিজ্ঞাসা করিতেন। লোকে অসঙ্কোচে তাঁহাকে সকল কথাই বলিত। ইহাতে বাড়ী ফিরিবার সময়ে তিনি গ্রামের প্রায় সমস্ত কথাই সংগ্রহ করিয়া আনিতেন।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ঝারিটি রাখিয়া রামকমল হয়ত' নিজের ধৌতবস্ত্রখানি নিজেই শুকাইতে দিতেন, এবং একটি ফুলের সাজি হাতে

লইয়া বাড়ীর সমীপস্থ ফুলবাগানে যাইয়া পূজার জন্য নিজের হাতে ফুল তুলিতেন। এই সময়ে দু' এক দিন কানাইলালের শিশুপুত্র আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিত, এবং "দাদা! আমি ফুল তুলিব, আমি ফুল তুলিব" বলিয়া তাঁহার হাতের সাজিটি বাড়াইয়া ধরিত। রামকমল আনন্দে গলিয়া যাইতেন। ফুলবাগান হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই গ্রামের অনেক লোক আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, এবং তাহাদের অভাব অভিযোগ প্রার্থনা ইত্যাদি জানাইত। রামকমল ফুলের বাগানে থাকিয়াই অনেকের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতেন, এবং সকলেরই কথার উত্তর দিতেন। সমাগত নরনারীদিগের মধ্যে অনেকেই কিছু না কিছু হাতে করিয়া আসিত। কেহ তাহার গরুর দুগ্ধ, কেহ তাহার গাছের একটি নাউ বা কুমড়া, কেহ দুটি শাক, কেহ দুটি কলা এবং সময়ানুসারে কেহ চারিটি আম, কেহ বা একটি কাঁঠাল ইত্যাদি। রায়-ঠাকুরের বাড়ীতে রিক্তহস্তে প্রায়ই কেহ আসিত না। আবার ইহাদের মধ্যে অনেকেই রামকমলের কাছে কিছু না কিছু প্রার্থনা করিত। কেহ দুটি মুগের ডাউল, কেহ বা একটু আকের চিনি, কেহ বা একটু মিষ্টি, কেহ বা কিছু পুরাতন ঘৃত। রামকমলের গৃহে দরিদ্র প্রতিবেশীর জন্য এই সমস্ত জিনিস সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকিত; এবং যাহার যখন যাহা প্রয়োজন হইত, সে আসিয়া তখন তাহা চাহিয়া লইয়া যাইত।

রামকমল ফুলবাগান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার তণ্ডুলাদি বিতরণ শেষ হইয়াছে। তিনি কুটুম্বদিগের আহারের আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতেছেন, এমন সময়ে কিশোরীলালের এবং বরযাত্রিগণের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। বরকন্যার নৌকা বরণ করিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া আনিতে হইবে বলিয়া এক জন লোক ঘাট হইতে সংবাদ দিতে আসিল। তাহার মুখে পূর্ব্বরাত্রির ঘটনার বিবরণ শুনিয়া বাড়ীর মধ্যে

একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কিশোরীলালের জননী "ওমা সে কি গো" বলিয়াই ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

রামকমল ক্ষুণ্ণ না হইলেন, এমন নহে, কিন্তু তিনি ভ্রাতৃজায়াকে প্রবোধ দিয়া কহিতে লাগিলেন,—"আপনি ইহাতে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা করিবেন না। আমি বলিতেছি, ইহাতে কোন অমঙ্গল হইবে না। এ কোন দৈববিপৎপাত নহে, মানুষের অত্যাচার মাত্র। ডাকাইতেরা যে বধূমাতার অঙ্গ স্পর্শ করে নাই, ইহাই মঙ্গলের বিষয় জানিবেন। গহনা বধূমাতার হইলে তিনি অবশ্যই তাহা আবার পাইবেন। আপনি চক্ষের জল ফেলিবেন না। বর বধূ ঘরে তুলিয়া আনুন। গোপীনাথ আছেন, তিনিই মঙ্গল করিবেন।"

রামকমলের বাক্যের শক্তি ছিল। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ দেবরকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। রামকমলের চরিত্র যেমন পবিত্র, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তিও তেমনই প্রবল ছিল। তিনি যাহা বলিবেন, তাহা কখনও মিথ্যা হইবে না. কেবল বাড়ীর লোকের কেন, তাঁহার পরিচিত অনেক লোকের এইরূপ এক বদ্ধমূল ধারণা ছিল। তিনি যখন বলিয়াছেন, ইহাতে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, তখন সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। ভ্রাতৃজায়া চক্ষের জল মুছিয়া বর বধূ আনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমস্তই রীতিমত সম্পাদিত হইল। আত্মীয় কুটুম্বদিগের আহারের আয়োজন, লোক জন বিদায়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছুতেই কোনরূপ ত্রুটি হইল না। ফলতঃ রামকমলের ব্যবহারে কেহই বুঝিতে পারিল না যে, কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। রামকমল থানা পুলিসে কোন সংবাদ দিলেন না, অন্য কাহাকেও কিছু জানাইলেন না। কানাইলালের স্ত্রীর অঙ্গ হইতে দুই একখানি আভরণ লইয়া নববধূর গাত্রে পরাইয়া দিলেন, আর সেই দিনই স্বর্ণকার ডাকাইয়া কয়েকখানি নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন

রামকমল আর যাহা করিলেন, তাহা বাড়ীর লোক ভিন্ন অন্য কেহ বড় জানিল না। বরবধূকে উপবাসী রাখিয়া তিনি তাহাদিগকে গোপীনাথের চরণামৃত পান করিতে দেন, আর তাহাদের অঙ্গে শান্তি-জল সেচন করেন। তাহাদের কল্যাণার্থ সেদিন নারায়ণকে অতিরিক্ত তুলসীও দিয়াছিলেন। লোকে বলিত রামকমলের যাহা কিছু অভাব অভিযোগ, তাহা তিনি গোপীনাথকেই জানাইতেন।

৬

বরযাত্রীরা দস্যুদিগের সম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক; তাহারা ভীমা বাগ্দীর দলের লোক বটে। এই সময়ে ভীমা বাগ্দীর নাম মধ্যবঙ্গের অনেক স্থলেই সুপরিচিত ছিল। ভীমার নাম অনেকে জানিত বটে, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াছে এমন লোকের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। ভীমা যেন লোক-লোচনের অদৃশ্য থাকিত। তাহার দলের লোক ভিন্ন অন্য কেহই প্রায় তাহার দর্শন পাইত না। সে নিজে কেবল দু' এক স্থলে ডাকাইতি করিতে যাইত, আর অধিকাংশ স্থলেই তাহার অনুচরেরা এই বীভৎস কার্য্য সম্পন্ন করিত। শতাধিক গ্রাম ব্যাপিয়া তাহার অনুচর ছিল। ভীমার কাছে যাইয়া তাহারা যেন দীক্ষিত হইয়া আসিত; এবং শেষে সুবিধামত যেখানে সেখানে দস্যুতা করিত। ভীমা তাহাদিগকে কয়েকটি সঙ্কেতবাক্য শিখাইয়া দিত, এবং ইহারই বলে তাহারা পরস্পর আপনাদের দলের লোক চিনিতে পারিত।

ভীমার গায়ে ভীমের ন্যায় বল ছিল। লাঠী খেলায় সে সিদ্ধহস্ত। কল কৌশল তাহার অনেক জানা ছিল। সে কখনও কোন সার্কাসের দলে যায় নাই, তথাপি তাহার শরীরকে সে নানা ভাবে চালাইতে পারিত। দুইখানি বংশখণ্ডের সাহায্যে সে এক রাত্রিতে পনের ক্রোশ পথ যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিতে পারিত। ভীমার পুত্র কলত্র কিছু ছিল না।

দস্যুতা করিয়া সে যাহা পাইত, তাহা প্রায়ই দরিদ্রের উপকারার্থ ব্যয় করিত। ভীমা অনেক সময়ে এক বাড়ী হইতে ডাকাইতি করিয়া অর্থ আনিয়া দশ বাড়ীতে তাহা বিতরণ করিয়া দিয়া আসিত। কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধ হইতেছে না, কেহ ভাঙ্গা ঘর বাঁধিতে পারিতেছে না, কেহ স্ত্রী পুত্র লইয়া উপবাসী রহিয়াছে, এমন কথা ভীমা জানিতে পারিলেই সে তাহাদিগকে সাহায্য করিত। প্রকাশ্যভাবে সে কিছুই দিত না, কিন্তু রাত্রিতে এমন ভাবে এমন স্থানে অর্থ রাখিয়া আসিত যে, পরদিন প্রভাতে তাহা সর্ব্বপ্রথমেই সেই দরিদ্র গৃহস্থের চক্ষে পড়ে। কেহ এরূপ অর্থ পাইলেই লোকে বলিত, এ "ভীমার দান" পাইয়াছে। সহসা কাহারও অবস্থার উন্নতি দেখিলেই প্রতিবেশীরা সন্দেহ করিত, এ সেই ভীমার কাজ বস্তুতঃ ভীমার নাম অনেক সময়ে অনেক স্থলে ঘোষিত হইত।

ভীমা সকল ঋতুতেই মহা আড়ম্বরে কালী পূজা করিত। কোনও বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা নিবিড় জঙ্গলে তাহার পূজার আয়োজন হইত। সন্ধ্যার পর সমস্ত উদ্যোগ আরম্ভ হইয়া রাত্রিতেই পূজা শেষ হইয়া যাইত। তাহার শিষ্যেরাই কেহ প্রতিমা, কেহ পূজার উপকরণ লইয়া আসিত। তাহারা ভিন্ন অন্য কেহই এ পূজার সন্ধান জানিত না। পূজা প্রায়ই প্রতি অমাবস্যার রাত্রিতে হইত, এবং এক পূজার স্থলেই পরবর্ত্তী পূজা কোথায় হইবে, তাহা স্থির হইয়া যাইত। শিষ্যগণ অন্য সময়ে যেখানেই থাকুক না কেন, অমাবস্যার রাত্রিতে আসিয়া সকলে ভীমার সহিত মিলিত হইত, এবং তাহার সহিত শেষ সাক্ষাতের পর কে কি কার্য্য করিয়াছে, তাহার এক প্রকার নিকাশ দিত। দস্যুতা করিয়া যে যাহা পাইত, তাহা তাহার সম্মুখে আনিয়া ধরিত. এবং সে ইচ্ছা করিয়া যাহাকে যাহা দিত, সে তাহাই লইত।

যাহারা কিশোরীলালের নৌকায় ডাকাইতি করিয়াছিল, তাহারাও

নিয়মিত প্রথামত পরবর্ত্তী অমাবস্যার রাত্রিতে অপহৃত দ্রব্যাদি লইয়া ভীমার নিকট উপস্থিত হইল। ভীমা তাহাদের নিকট ঘটনার বিবরণ শুনিয়াই অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিল, এবং কহিল,—"আমার কোন শিষ্য বোধ হয় এ পর্য্যন্ত এ প্রকার ডাকাইতি করে নাই। আমি কি পুনঃপুনঃ তোদের বলিয়া দিই নাই যে, যাহারা গরীবের সর্ব্বনাশ করিয়া পয়সা করে, তাহারাই আমার শত্রু? তোরা জানিস কোন্ ব্রাহ্মণের এইরূপ অনিষ্ট করেছিস্? বিয়ের কনে, তার গা থেকে গয়না খুলে আনা! যা, দূর হ আমার সাম্‌নে থেকে। আমি ইহার কিছুমাত্রও স্পর্শ করিব না।"

দস্যুদল অপ্রস্তুত হইল, এবং আত্মসমর্থনার্থ কহিল,—"যে বামুনের বাড়ীর বউ, সেও বড় ভাল লোক নয়। তার টাকা যথেষ্ট আছে, সে টাকা লাগায়, আর সুদ খায়। তার বাড়ী অনেক দূর বটে, কিন্তু আমরা সব খবর রাখি।"

ভীমা একটু নরম হইল। সে কখনও গোপীনাথপুরের দিকে যায় নাই। দস্যুরাও রামকমল রায়ের নাম করে নাই। সে কহিল,—"আচ্ছা যা গয়নাগুলি আমি রেখে দিচ্ছি, আর এর দাম যা হ'তে পারে, তা তোদের দিয়ে দিচ্ছি। তোরা এই টাকা নিয়ে যা। আমি সে ব্রাহ্মণের সন্ধান নেবো। যদি সে গরীবের সর্ব্বনাশ করা লোক হয়, তবে তার বাড়ীতে ডাকাতি করবো; আর যদি ব্রাহ্মণ ভালমানুষ হয়, তা হ'লে তোদের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নাই।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামকমল রাত্রিতে লোককে টাকা ধার দিতেন। মানুষের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অত্যন্ত অধিক ছিল। মানুষও প্রায়ই তাঁহাকে বঞ্চনা করিত না। তিনি জীবনে কখনও কাহারও বিরুদ্ধে রাজদ্বারে যান নাই। রাজদ্বারে যান নাই, কেবল তাহাই নহে, কখনও

আদালত, ফৌজদারীর নাম মুখে আনিতেন না। কোন লোক তাঁহার সহিত কোন দুর্ব্যবহার করিলে, বা অন্যের সহিত অকারণে বিবাদ বাঁধাইলে, রামকমল তাহাকে কহিতেন,—'তুই ত ভারী ঠ্যাটা, জমিদারবাড়ী থেকে পেয়াদা আনিয়ে তোর বাড়ীতে বসাইয়া রাখা দরকার।' বলা বাহুল্য, লোকের প্রতি এই তাঁহার অতি উচ্চ ভৎসনা ছিল।

একবার কোন একটি লোক রামকমলের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া, অনেক দিনের মধ্যে তাহা পরিশোধ করে নাই। তাহার বাড়ী রামকমলের বাড়ী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। কানাইলাল এখন অনেক সময়ে কাগজপত্র দেখেন, এবং বিষয়কর্ম্মে পিতৃব্যের সাহায্য করেন। খাতায় ঐ লোকটির নাম দেখিয়া এক দিন তিনি আহারান্তে তাহার বাড়ী যাইয়া টাকাটির জন্য তাগাদা করিবেন বলিয়া কাপড় পরিতেছেন, এমন সময়ে রামকমল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কানাই! কোথায় যাও?"

কানাই লোকটির নাম করিয়া কহিলেন, "দেখি একবার গিয়ে, যদি টাকাগুলি দেয়।"

রামকমল কহিলেন,—"আঃ গোপীনাথ! তুমি কেন তার বাড়ীতে যাবে? তার যখন হ'বে, তখন সে আপনিই এসে তোমার টাকা দিয়ে যাবে।"

কানাইলাল কাপড় খুলিয়া রাখিলেন।

দেশের সৌভাগ্যক্রমে তখন যেমন রামকমল রায়ের ন্যায় মহাজন ছিলেন, সাধারণলোক ও খাতকেরাও তেমনই সরল ও অপ্রবঞ্চক ছিল। লেখাপড়ায় এত বাঁধাবাঁধি দলীলদস্তাবেজ প্রভৃতি ছিল না। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস ছিল যে, রামকমল রায়ের ন্যায় মহাজনকে এক পয়সা ফাঁকি দিলে, দশ পয়সা লোক্‌সান হইবে। সকলেই মনে করিত,—তিনি যেমন এক কথায় টাকা দিয়াছেন, তেমনই এক কথায় শোধ

করিতে চেষ্টা করিব। আজ কাল যেমন মহাজনেরা অনেক সময়ে মিথ্যা নালিশ করেন, খাতকের প্রদত্ত টাকা প্রাপ্তি অস্বীকার করেন, আবার খাতকেরাও তেমনই রেজেষ্টারী-দলিল অস্বীকার করে, অথবা অন্যরূপ মিথ্যা জবাব দেয়। রামকমলের আমলে ইহার কিছুই ছিল না। তখন পল্লীগ্রামে লেখাপড়া অধিক প্রবেশ করে নাই। রামকমল ত দূরের কথা, কানাইলাল কিম্বা কিশোরীলালের হাতে টাকা দিয়াও, কেহ কখনও কোন রসীদ্ বা নিদর্শন-পত্র প্রার্থনা করে নাই।

পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার পরবর্ত্তী কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে এক দিন বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে, রামকমল গোপীনাথের মন্দিরের দিকে যাইতেছেন, এমন সময়ে একটি অপরিচিত যুবক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রামকমল তাহার পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল,—"আজ্ঞে, আমি হরি ঘোষের ছেলে, আমার নাম কানাই। আমার বাপ এই গ্রামেই বাস করিতেন। পনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে অবস্থা খারাপ হওয়ায় তিনি এখান হইতে পলাইয়া যান। আমি তখন ছেলে মানুষ। আমরা দু'টি ভাই। এখন আমরা ভড়ভড়ায় আছি; বাবা মারা গিয়েছেন। মা বেঁচে আছেন। ঈশ্বর-ইচ্ছায় এখন আমরা দুটি ভাই-ই কাজ কর্ম্ম করতে শিখেছি। আমার বিবাহের সম্বন্ধ হ'চ্ছে। এক দিন মা বল্লেন, 'বাবা! বিবাহ করিবার আগে একটা কাজ ক'রতে হ'বে। যখন আমরা গোপীনাথপুর ছেড়ে আসি, তখন রায় ঠাকুরের কাছে কিছু দেনা ছিল; সেই টাকাটা শোধ করা চাই। রায় ঠাকুরের টাকা যে মারে, তার কখনও ভাল হয় না।' আমি সেই জন্য এসেছি। বাবা কত ধা'রতেন, জানি না। দয়া করিয়া একবার হিসাবটা দেখিবেন, আমি বাবার দেনা শোধ করিব।" যুবকের চক্ষু দিয়া একটু জল পড়িল।

রামকমল কিছুকাল ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

"তুই হরির ছেলে কানাই এত বড় হয়েছিস্! যা, তেল টেল মাথ্‌গে, স্নান কর, খা দা, তার পর হিসেব দেখা যাবে। সে আর ইচ্ছা করে' টাকা ফেলে রাখে নাই। ব্যারাম হয়ে একবারে অচল হয়ে পড়্‌লো, তাই তার শ্বশুরবাড়ী না কোথায় চলিয়া গেল। হরি বরাবর আমাদের দই ক্ষীর ছানা দিয়েছে। তার দেনার কথা আমার মনেই নাই।"

গোপ-নন্দন আহারাদি করিল। অপরাহ্নে হিসাবের কথা জিজ্ঞাসা করায়, রামকমল এক পুরাতন কাগজ বাহির করিলেন, এবং কহিলেন, —"হাঁ, দেনা আছে চব্বিশ টাকা।"

হরির পুত্র মায়ের কথা মত পঞ্চাশটি টাকা আনিয়াছিল। সে কহিল,—"আর সুদ কত দিতে হ'বে?"

রামকমল কহিলেন,—"তুই চব্বিশ টাকাই দে, সুদ এক পয়সাও দিতে হ'বে না। হরির কাছে আমি কখনও সুদ নিই নাই। টাকা নিত, আর দই ক্ষীর ছানা দিত।"

যুবক প্রফুল্লবদনে চব্বিশটি টাকা রামকমলের পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—"তা হ'লে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি বিদায় হই।"

রামকমল চারিটি টাকা হাতে লইয়া কহিলেন,—"এই তোর আশীর্ব্বাদ; বেঁচে বর্ত্তে থাক্, সুখী হ'।"

কানাই টাকা কয়েকটি দেখিয়া কহিল,—"এমত আজ্ঞা করিবেন না; আমাকে মুখে আশীর্ব্বাদ করুন।"

রামকমল কহিলেন,—"তোর ত বিয়ে হ'বে বলছিলি; হরির ছেলে, তুই আমার আশীর্ব্বাদ নিবি না? আচ্ছা, আমি তোর আইবুড়ো-ভাতের কাপড় দেবো। আর তুই আজ যাবি কোথা? বেলা গেছে, আজ থাক্। কানাই বাড়ী নাই, সে হয় ত রাত্রেই আস্‌বে। তার সঙ্গে দেখা ক'রে কাপড় নিয়ে কাল সকাল বেলা যাস্।

কানাই তোর সঙ্গে ছেলেবেলায় কত খেলা করেছে। তোর নামে নাম। তুই তার চেয়ে ক' মাসের বড়। হরি এক এক দিন তোরে কোলে ক'রে আন্‌তো। যা, আজ একবার গ্রামটা বেড়াইয়া সকলের সঙ্গে দেখা শুনা করে আয়। তোর বাপ্‌কে না চিন্‌তো কে? তোকে দেখলে গ্রামের বুড়ো বুড়ীরা অনেকেই খুসী হবে।"

কানাই আর বাক্যব্যয় করিল না। রামকমলের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার সম্বন্ধে তার মার কাছে যা শুনিয়াছিল, মনে মনে তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাহার প্রাণ ভরিয়া গেল। সে রায়বাড়ীর এক জন চাকর সঙ্গে লইয়া গ্রাম দেখিতে চলিল।

হরি ঘোষের পুত্র সন্ধ্যার সময়ে ফিরিয়া আসিল, এবং গোপীনাথের মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পূজা ও আরতি দেখিল। আরতি শেষ হইয়া যাইবার পর সে ভক্তিগদ্‌গদ-চিত্তে দুইটি টাকা বিগ্রহের প্রণামী দিল। রামকমল কহিলেন,—"কি রে! কাপড় দেবো বলেছি ব'লে তার দামটা আগে দিয়ে রাখ্‌ছিস বুঝি! তা দে, ঠাকুরকে দিবি, তাতে আমার কি?"

রামকমল কানাইলালের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। তাঁহার বাড়ী আসিবার কথা ছিল। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলেও যখন তিনি আসিলেন না, তখন আহার করিতে গেলেন। হরি ঘোষের ছেলে, ঠিক ঘরের ছেলের মত বাড়ীর ভিতরে যাইয়া প্রসাদ পাইল।

আহারান্তে রামকমল শয়ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বাড়ীর ভিতরে সংবাদ গেল যে, এক জন অতিথি আসিয়াছে। রামকমল বাহিরে আসিলেন দেখেন, এক জন দীর্ঘকায় পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুক রামকমলকে দেখিয়াই প্রণাম করিয়া কহিল,—"অতিথি।"

রামকমল কোনও পরিচয় না জিজ্ঞাসা করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"রাত্রিতে কি খাবেন?"

অতিথি উত্তর করিল,—"আজ্ঞে দু'টি মাছের ঝোল ভাত প্রসাদ হ'লেই ভাল হয়, নচেৎ যা দেন, তাই।"

অতিথি আসিয়াছে শুনিয়া কানাইলালের জননী শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরবাড়ীর দরজার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আহারাদির বন্দোবস্ত ত সমস্তই তাঁহার হাতে। অতিথির কথাগুলি তাঁহার কানে গেল। রামকমল বাড়ীর ভিতরে আসিতেই পথে তাঁহার দর্শন পাইলেন। "এই যে আপনি উঠেছেন" বলিয়া তিনি ভ্রাতৃজায়াকে অতিথির আহা-রের কথা কহিবেন, এমন সময়ে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া কহিলেন,—"উঠেছি ত, এত রাত্রে মাছ কোথায় পাইব ?"

রামকমল কহিলেন, "আপনি তা হ'লে অতিথির কথা শুনেছেন। মাছ পেলেই ভাল হয়। বাড়ীতে কি কিছু নাই ?"

রমণী উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আছে, কইবিলের গোটাকতক বড় বড় কই মাছ। কানাই সেগুলো বেছে বেছে রেখে দিয়েছে, কই মাছ বড় ভালবাসে! সেই মাছ ক'টি তার জন্যে জিয়ানো আছে।"

রামকমল মহা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—"তা হ'লে আর পুকুরে জাল নামাবার জন্য এত রাত্রে জেলে ডাকৃতে হ'বে না। আমি কনাইএর জন্য আবার কই মাছ আনিয়ে দেবো। আপনি ঐ মাছগুলি অতিথির জন্য দিন।"

কানাইলালের জননী দ্বিরুক্তি না করিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন, এবং জিয়ানো কই মাছগুলি কুটিবার ব্যবস্থা করিলেন।

অতিথি তাঁহার কথাগুলি সমস্তই শুনিয়াছে। কানাইলালের মাতা মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিলেন বলিয়া, অতিথি অনেকটা অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রামকমল ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার কথা শেষ হইতেই অতিথি যাইয়া হরি ঘোষের পুত্রের প্রতি কিঞ্চিৎ অত্যাচার আরম্ভ করিল।

সে ঘুমাইয়াছে, তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিল। তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের সংবাদ লইয়া শেষে, সে কেন এই বাড়ীতে আসিয়াছে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গোপ-নন্দন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সকল প্রশ্নের উত্তর দিল।

অতিথি শেষে কহিল,—"আমি ভাত খেয়ে নি', দু' জনে এক সঙ্গে শোব।"

হরির পুত্র এ অনুরোধ রক্ষা করিল না, সে কহিল,—"আপনিই এখানে শোবেন, আমি অন্যত্র যাইয়া শুইতেছি।" এই বলিয়া সে উঠিয়া গেল। অতিথি এই সময়ে আহার করিতে আহূত হইল।

সে দেখিল, বাস্তবিকই কইমাছগুলি অতিশয় লোভনীয়, রন্ধন অতি সুন্দর হইয়াছে। রামকমলের বাড়ীর রন্ধনের খ্যাতি ছিল। কানাই-লালের জননী কইমাছও অনেকগুলি রাঁধিয়াছেন, এবং সমস্তই অতিথিকে দিয়াছেন। তাঁহার দেবর বলিয়া দিয়াছিলেন, লোকটি বোধ হয়, ভোক্তা ভাল, মাছের ঝোল কিছু বেশী পরিমাণ করিবেন। অতিথি অতি তৃপ্তির সহিত সমস্তই খাইল, এবং আহারান্তে বাহিরবাটীতে আসিয়া শয়ন করিল।

পর দিন প্রভাতে রামকমল যখন হরি ঘোষের পুত্রকে কাপড় দিতে আসিলেন, তখন পূর্ব্ব রাত্রির অতিথিকে দেখিতে পাইলেন না। গোপ-পুত্র কহিল,—"সে খানিক রাত্রি থাকিতেই চলিয়া গিয়াছে। আপনি যখন স্নানে যান, তার অনেক আগে। আমার রাত্রিতেই ভয়ে ঘুমই হয় নাই। লোকটির কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী কেমন এক রকমের। আমাকে বলে' ছিল কাছে শু'তে, আমি তা শুই নাই।" রামকমল কেবল কহি-লেন,—"লোকটা খেতেও পারে বেশ।"

ইহার পর এই অতিথি সম্বন্ধে আর বিশেষ কোনও আলোচনা হইল

না। বাড়ীর অনেকে তাহাকে দেখেই নাই। হরি ঘোষের পুত্র চলিয়া গেল।

পূর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত ঘটনার পর আট দিন গিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে একদিন রাত্রিতে রামকমল আহারান্তে বাড়ীর ভিতরে বসিয়া আছেন, কানাইলালের স্ত্রী আহারে নিযুক্ত, তিনি রন্ধনশালায় রহিয়াছেন, তাঁহার শিশু পুত্রটি রামকমলের কাছে রহিয়াছে। সে জাগিয়া থাকিলে এইরূপ সময়ে রামকমলের নিকটেই থাকিত। রামকমল তাহার সহিত কথা কহিতেছেন। উভয়ে বিবাদ বাধিয়াছে। রামকমল বলিতেছেন, "রান্নাঘরে বসে' আছেন আমার মা।" বালক বলিতেছে, "না আমাল মা।" রামকমল আবার কহিতেছেন, "না আমার মা।" বালক পুনরায় বলিতেছে, "না আমাল মা।" রামকমল ভ্রাতুষ্পুত্রবধূকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মা! তুমি কার মা?" শিশু কাঁদিয়া কহিতেছেন, "আমাল মা।" রামকমল বলিতেছেন, "তবে আমি কাঁদি, আমি মা পাব না—উঁ উঁ।" বালক তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিতেছেন, "না, আমালও মা, তোমালও মা। রামকমল শিশুকে চুম্বন দিতেছেন, আর কহিতেছেন, "আচ্ছা তাই ঠিক।" এমন সময়ে বাহির হইতে একটি লোক আসিয়া বলিল, "একজন অতিথি আসিয়াছে।" রামকমল শিশুকে কোলে লইয়াই উঠিলেন। বাহিরে যাইয়া দেখেন যে, সে দিন রাত্রিতে আসিয়া যে কানাইলালের কইমাছ খাইয়া গিয়াছিল, আজ আবার সেই অতিথি।

রামকমল কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই অতিথি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, এবং তাঁহার পায়ের কাছে একটি পুঁটুলি রাখিয়া কহিল,—"এই আপনার ভাইপো বধূর গহনা। আমার নাম ভীম সর্দ্দার। গহনাগুলি মিলিয়ে দেখুন সব আছে কি না।"